তরাই

সমরেশ বসু

অনির্বাণ প্রকাশনী
৩এ, গঙ্গাধরবাবু লেন কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
রুদ্রেন্দু সরকার
অনির্বাণ প্রকাশনী
৩এ, গঙ্গাধরবাবু লেন
কলিকাতা-১২

সহযোগিতায় :
ইউ, বি, আই

মুদ্রক :
হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১, রমাপ্রসাদ লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

প্রথম সংস্করণ :
১লা বৈশাখ ১৩৭১

সাধের সঙ্গে সাধ্যের তারতম্য অনেকখানি। তার প্রমাণ আমার এই ছোট রচনাটি। কাহিনীটিকে আরও বিস্তৃত করে লেখার সাধ ছিল। নানা কারণেই তা সম্ভব হয়ে উঠল না। অবিশ্যি মূল কাহিনী তাতে কোথাও ব্যাহত হয়নি। পরবর্তী সংস্করণে, নতুন করে কিছু সংযোজনের ইচ্ছা রইল।

পরিশেষে, এই ছোট কাহিনীটি সম্পর্কে একটি কথাই আমার নিবেদন করার আছে। তা হল, পৃথিবীর অনেকের মতো আমারও দৃঢ় বিশ্বাস, প্রকৃতপক্ষে বাস্তবের চেয়ে অপ্রাকৃত এবং আকস্মিক আর কিছুই হতে পারে না। আমাদের ছকে মেলানো সত্যের থেকেও বাস্তব অনেক বেশি অবিশ্বাস্য। মানুষের রচনার থেকে, তা বিস্ময়কর।

স. ব.

ত রা ই

উদিত হাওড়া স্টেশনে, বুকস্টলের সামনে দাঁড়িয়ে ম্যাগাজিন দেখছিল। তেমন যে মনোযোগ দিয়ে দেখছে, তা মনে হয় না। মাঝে মাঝেই, হাত উল্টে ঘড়ি দেখছে, আর ঠোঁট উল্টে বিরক্তি প্রকাশ করে, ম্যাগাজিনের পাতা ওল্‌টাচ্ছে। কোন পাতায় একটা ছবি হয় তো কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে দেখছে, তারপরেই আবার যাত্রীদের আসা যাওয়ার দিকে চোখ পড়ছে। যত যাত্রী আসছে, তাদের পায়ে পায়ে জল আর কাদা ছড়াচ্ছে।

একে কী ধরনের বৃষ্টি বলে, উদিত বুঝতে পারে না। আকাশের থেকেও, ওর মুখের অবস্থা খারাপ হয়ে ওঠে। ঝরঝর করে বৃষ্টি হয় বা ঝিরঝির করে হয়, তার একটা মানে বোঝা যায়। মাঝে মাঝে হচ্ছে, মাঝে মাঝে থামছে, অথচ আকাশ মুখ কালো করেই আছে। আর এই কলকাতার বৃষ্টি, আরো বিশ্রী। ঝরতে না ঝরতেই, রাস্তা ডুবে যাবে, আর ঠিক কাজের সময় কোথাও বেরোবার মুখেই, বৃষ্টিটি বেশ আনন্দে গদগদ হয়ে নেমে আসবে।

কলকাতার বৃষ্টির দস্তুর এইরকম। উদিত নিজের ভেজা জামা প্যান্টের দিকে একবার তাকালো। আর একবার ঝাড়া নাড়া দিল, যদিও, ঝরবার মত জল এখন আর জামা প্যান্টে নেই, সবই প্রায় গায়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। তারপরে ফ্যাঁচর ফ্যাঁচর হাঁচো, নাক চোখ দিয়ে জল গড়াক, গা হাত পা ব্যথা হোক, ফ্লু বাগিয়ে শুয়ে থাকো। যাচ্ছেতাই! কিন্তু তাহলে তো চলবে না। উদিতের অনেক কাজ আছে।

আর একটু দেরি করে এলেও অবিশ্যি ক্ষতি ছিল না। গাড়ি ছাড়তে এখনো প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকী। কিন্তু যাত্রীর ভিড়ে, উদিতের বিরক্তি যেন আর ধরছে না। এত লোকের আজ বাড়ি থেকে বেরোবার কী দরকার। দুর্যোগ দেখলে কি লোকের বাইরে যাওয়ার দরকার বেড়ে যায় নাকি। দেখেশুনে সেইরকমই মনে হচ্ছে। অথচ এর মধ্যেও, সকলের সাজগোজ চাই, আর সে সাজগোজের কী দুর্দশা। বিশেষ করে মেয়েদের। মুখের রঙ উঠে গিয়েছে, কপালের টিপ জলে ধুয়ে গিয়েছে, শায়ার ফ্রিল পায়ে জড়িয়ে, হাঁটতে গিয়ে, আছাড় খাবার যোগাড়। তার ওপরে যারা ফিনফিনে পাতলা শাড়ি পরেছে, তাদের তো কথাই নেই। নিজেদের নিয়ে, নিজেরাই বিব্রত। ধুতি পাঞ্জাবী পাগড়িওয়ালাদের দুর্দশাও কম না। সব থেকে খারাপ অবস্থা বাচ্চাদের। এমন দিনে কেউ মেয়ে আর বাচ্চাদের নিয়ে বেরোয়। আজকাল লোকের সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি।

অবিশ্যি, সকলের অবস্থাই এ রকম কাক ভেজা না। অনেকে বেশ ঝরঝরে শুকনো অবস্থাতেই ভেতরে এসে ঢুকছে। শুকনো ঝরঝরে মেয়ে পুরুষ দেখলেই বোঝা যায়, এসব সৌভাগ্যবান ও বতীরা ট্যাক্সিতে বা নিজেদের গাড়িতে এসেছে। জামাকাপড়ের সঙ্গে, চুলের পাটও ঠিক আছে। আর যারা গাড়ি নিয়ে সরাসরি প্ল্যাটফরমের গায়ে চলে যাচ্ছে, তাদের তো কথাই নেই। বৃষ্টির জন্য

তাদের ভাবনা নেই।

কিন্তু তা-ই কী? এর নাম কলকাতা। বৃষ্টি ভেজা কলকাতায় আবার গাড়ি চলা চাই, তবে তো। মাঝপথেই হয় তো, কারবোরেটর এক ঢোক জল খেয়ে, বিগড়ে বসে রইল। তারপরে ঠ্যালার নাম বাবাজী। তখন মনে হবে, সরকারি বড় বড় গাড়িই ভাল। ভিজে হলেও, গন্তব্যে পৌঁছনোর আশা থাকে।

উদিত বুকস্টলে দাঁড়িয়ে, ম্যাগাজিন দেখতে দেখতে, এইরকম সাত পাঁচ ভাবছিল। মাঝে মাঝে লোকজনের দিকে দেখছিল। প্ল্যাটফরমে গিয়েও সেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। সেখানে আরো ভিড়। অল্প পরিসরে লোক বেশি, মালপত্রের গাদাগাদি। তার চেয়ে এখানেই ভাল। ওর নিজের ঘাড়ে একটা মাত্র বড় ব্যাগ, তাতেই ওর দরকারি সব কিছু আছে। দাড়ি কামাবার জিনিসপত্র থেকে, নখ কাটবার নরুণ পর্যন্ত।

কথাটা ভেবে, উদিতের হাসি পেল। নরুণ পর্যন্ত আছে, কিন্তু জামাকাপড়ের বহর সেই পরিমাণে, সত্যি হাস্যকর। নেহাত শীতকাল না, তা-ই রক্ষে। আরো গোটা দুয়েক প্যান্ট, খান তিনেক জামা, সবই শস্তা আর মোটা। একজোড়া হাওয়াই চপ্পল। তার সঙ্গে জাঙি গেঞ্জি মিলিয়ে চার পাঁচ পীস্। যথেষ্ট। অনেক গরীব মানুষের থেকে অনেক বেশি। চপ্পলটার কথা মনে হতেই, পায়ের দিকে তাকাল ও। এখন ওর পায়ে বুট জুতো। মোটা সোলের জুতো জোড়া ভিজে এখন ওজন দাঁড়িয়েছে, কে. জি. দশেক। গাড়িতে উঠে, আগেই এটাকে ছাড়তে হবে, ব্যাগ থেকে বের করে, চপ্পল পরতে হবে। সেইভাবেই জামা প্যান্টও বদলে নিয়ে, কোথাও শুকোতে দেবার চেষ্টা করতে হবে। তারপরে দেখা যাক, কত বড়লোক হতে ও যাত্রা করেছে।

কথাটা মনে হতেই, এই বর্ষার মতই বিরক্ত আর তিক্ত হয়ে

উঠল উদিতের মন। লোকে কাজের জন্য আসে কলকাতায়, ওকে ফিরে যেতে হচ্ছে কলকাতার বাইরে। না, কলকাতায় কোন চাকরি নেই। কলকাতায় কোন কাজ নেই। কলকাতায় আছে কেবল কথা। কে যেন লিখেছিলেন, কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে। বিরক্তির এইসব কবিতা। যখন কবিদের যা মনে আসবে, তখন তাই লিখবেন, তারপর মরোগে পাঠকেরা। তার চেয়ে বলা ভাল, কলকাতা হবে কোটি কোটি মানুষের শহর, গাদাগাদি গাজাগাজি কাড়াকাড়ি মারামারি। একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের শহর। যেখান থেকে মানুষ প্রতি মুহূর্তে পালাতে চাইবে।

আসলে, উদিতের এটা আঙুরফল টকের মত রাগের মনোভাব। যা পাওয়া যায় না, তাই শেষ পর্যন্ত খারাপ। কলকাতা ছেড়ে যেতে হচ্ছে, সেই দুঃখে আর বিরক্তিতেই ওর এসব মনে হচ্ছে। কলকাতাতেই ও থাকতে চেয়েছিল, একটা কোন কাজকর্ম নিয়ে। অনেকদিনের চেষ্টাতেও কিছু হল না। এমন কি, উদিত নিজে চেয়েছিল, মোটর ড্রাইভারের কাজ করতে। তাতে আবার দাদার আপত্তি।

তার বক্তব্য, এতটা নিচে নামার কী দরকার। এতটা জলে পড়ার মত অবস্থা তো আসেনি। বাড়ির অবস্থা এত খারাপ না, কোনরকমে চলে যাবে। যাই হোক, বাবার নামে চা বাগানের যা শেয়ার আছে, তাতে এখনো বছরে ডিভিডেণ্ড হিসাবে প্রায়, চার পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যায়। দাদা নিজেও, বাড়িতে মাসে প্রায় দেড়শো দুশো টাকা পাঠায়।

সেটা উদিতের ভালই জানা আছে। তার জন্য, মোটর ড্রাইভারিটা ছোট কাজ কেন, নিচে নামারই বা কী আছে। এ ধরনের ভদ্রলোকের জীবনযাপনে বা বোধে, ওর কোন আস্থা নেই। অবিশ্যি, গাড়ি চালানো বিদ্যেটা ও কোনদিনই, জীবিকার জন্য শেখেনি। ওটা একটা হয়ে যাওয়ার ব্যাপার। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে

থেকে, এর তার গাড়ি চালিয়ে, চালানোটা শেখা হয়ে গিয়েছে। এবং বেশ ভালভাবেই শেখা হয়েছে। যে-কোন পেশাদার ভাল ড্রাইভারের থেকে, ওর শেখাটা আরো কয়েক ডিগ্রি ওপরে। কারণ ও জীবিকার জন্য শেখেনি। গাড়ি চালানোটাকে, একটা সহজ খেলনার মত কব্জা করতে চেয়েছিল, পেরেছেও। ষ্টিয়ারিং ধরে বসলে, ও নতুন মানুষ হয়ে ওঠে। যদিও আজ অবধি কোন লাইসেন্স করা হয়নি। কারণ, তার কোন দরকার পড়েনি।

কিন্তু সত্যি কি, ভদ্রতাবোধের এই চিন্তাটা, নিতান্ত বাস্তববোধ আর মনের উদারতা থেকে এসেছে উদিতের মনে। নাকি আসলে কলকাতায় থাকতে পারার জন্যই, যা পারা যায়, তার জন্যই এই মনোভাব। একথা নিজের কাছে একটা প্রশ্নের মত এসে দাঁড়াতেই, রেখার কথা ওর মনে পড়ে গেল। রেখা বৌদির বোন, ওরা কলকাতায় থাকে। আসলে, উদিতের কাছে, এক হিসাবে দেখতে গেলে, এখন কলকাতার আর এক নাম বোধহয় রেখা। কে জানে, বেকার ভাইকে দাদা হয় তো সেজন্যই আরো তাড়াতাড়ি কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

উদিতের মন এখন অন্যদিকে বাঁক নিল। একটু কুটিল আর জটিল দিকে। বৌদি কোনরকমে দাদাকে ওর বিরুদ্ধে বলেনি তো। রেখার সঙ্গে ওর মেশামেশি, রেখার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া, সিনেমা দেখতে যাওয়া, এসব হয় তো ইদানিং বৌদির আর ভাল লাগছিল না, দাদাকে নানারকম ভাবে তাই হয়তো বলেছে। দাদা তো আর সারাদিনে দেখতে আসছে না, উদিত কোথায় যাচ্ছে, কে বাড়িতে আসছে, কার সঙ্গে ও বেড়াতে যাচ্ছে। দাদা বৌদি হয় তো শলাপরামর্শ করেই ওকে তাড়াল।

কিন্তু, না কথাটা ঠিক মনে ধরল না। বৌদির পূর্বাপর কোন ব্যবহারেই, ও ধরনের কিছু বোঝা যায়নি। বরং অন্যদিকেই যেন ইয়ারকি ঠাট্টার ঝোঁক দেখা যেত। দাদার সঙ্গে, এসব বিষয়ে

হয় তো কোন কথাই হত না, হলেও, সেটা নেহাতই হাসির পর্যায়ে পড়ে। কেননা, রেখা তাহলে, উদিতকে কিছু বলত। এসব ক্ষেত্রে, যদি সাবধানতার দরকার হয়, তাহলে মেয়েদেরই আগে বলা হয়, তাদের সাবধান করা হয়। বাড়িতে, দিদি আর বোনদের ক্ষেত্রেও তাই দেখা গিয়েছে। এটা ভাল হচ্ছে না, বা এটা মন্দ হচ্ছে, আগেই বলা হয়। বৌদিদি যদি সেরকম কিছু মনে করত, তাহলে, নিজের বোনকে সে আগেই কিছু বলত।

তবে এর মধ্যে একটা কথা আছে। বলবার মত কোন অবস্থার সৃষ্টিই হয়নি। রেখার সঙ্গে উদিতের এমন কিছু ঘটেনি বা দেখাও যায়নি, যাতে কিছু বলা যায়। উদিতের যেমন একটা ভাল লাগার ব্যাপার ছিল, রেখারও সেইরকম। কলকাতায় এসে, প্রথম পরিচয়ের আড়ষ্টতা কেটে যাবার পরে, এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, ওদের দুজনের দুজনকে ভাল লাগছে। দাদার বাসা থেকে, তার শ্বশুরবাড়ি বেশি দূরে না। রেখার পক্ষে যাতায়াত, বিশেষ অসুবিধার ছিল না। উদিতের মনে আছে, রেখা একদিন বিকালে আসার পরে, বৌদি হেসে বলেছিল, 'কীরে রেখা, এত ঘন ঘন আসছিস কেন?'

রেখা অবাক হয়ে বলেছিল, 'ঘন ঘন আবার কী, এরকমই তো আসি তোমার বাড়িতে।'

বৌদির গলা আর একটু রহস্যে তরল হয়ে উঠেছিল, বলেছিল, 'মোটেই না, দিদির বাড়িতে তো এত টান আর দেখিনি।'

রেখা বলেছিল, 'দেখ দিদি, এরকম বলো না, তাহলে আর আসব না।'

বৌদি হেসে উঠেছিল। বলেছিল, 'আহা চটছিস কেন। আসলে, আমার দেওরটি তো কোনদিক থেকে খারাপ না। মেয়েদের একটু টনক নড়তে পারে।'

উদিত অবিশ্যি তখন সামনে ছিল না, কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে সব কথাই শুনতে পাচ্ছিল।

রেখা বলেছিল, 'কাঁচকলা তোমার দেওর। দেখতে মাকাল ফল, গুণে বেকার। আমার কোনদিন টনক নড়বে না।'

'ইস্, তোর যে দেখি অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না।'

'অহংকার কিসের, যা সত্যি, তাই বললাম। নেহাত, কলকাতায় তোমার দেওরের কোন বন্ধুবান্ধব নেই, রাস্তাঘাট চেনে না, কোন বাস ট্রাম কোথায় যাবে জানে না, অজ পাড়াগেঁয়ে বাঙাল, তাই একটু সঙ্গে যাই।'

তারপরে আর বিশেষ কিছু শোনা যায়নি, কেবল একটু হাসি। কিন্তু সামনাসামনি দেখা হবার পরে, উদিত কিছু বলেনি। যেন ও দুই বোনের কথাবার্তার কিছুই শোনেনি। পরে রাস্তায় বেরিয়ে, উদিত আর থাকতে পারেনি। যদিও, রেখার ব্যবহারে ওর কিছুই খারাপ মনে হয়নি, তবু না বলে পারেনি, 'দেখতে মাকাল ফল, গুণে বেকারের সঙ্গে বেরোতে, তোমার খারাপ লাগে না তো রেখা?'

রেখা চমকে উদিতের দিকে তাকিয়েছিল। তারপরে, রাস্তার ওপরেই খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। রেখার হাসিটা এমনই, উদিতের মনের কোণে কিছু থাকলেও, তা ধুয়ে গিয়েছিল। রেখা বলেছিল, 'আপনি সব শুনেছেন বুঝি?'

'তা শুনেছি।'

'শুনেও, আমার কথায় চটে গেছেন?'

'চটিনি, মানে—।'

রেখা বলে উঠেছিল, 'বিশ্বাস করেছেন, আমি সত্যি তাই ভেবে বলেছি?'

'না না, তাও ঠিক না।'

'কিন্তু বলব না-ই বা কেন শুনি? দিদি কেন আমাকে ওরকম করে বলছিল। যেন আপনার থেকে সুপুরুষ আর হয় না।'

তখন উদিতের নিজেরই হাসি পেয়েছিল। সব ব্যাপারটাই ঠাট্টা। এইভাবেই ওদের দুজনের মধ্যে, কিছুটা ঘনিষ্ঠতা জমে

উঠেছিল। যদিও সেটা দুয়ে দুয়ে চারের মত, একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকেই যাচ্ছিল না। কিন্তু মনে মনে কোথাও দুজনের, কিছু একটা ঘটছিল। তার প্রমাণ, দুজনের সঙ্গে দুজনের দেখা হলে, চোখে মুখে ঝলক ফুটে উঠত। দেখা না হলে, দুজনেরই খারাপ লাগত। বৌদির ঠাট্টায় সেটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠত।

আরো বেশিদিন কলকাতায় থাকলে, কী হত বলা যায় না। কিছু হওয়ার আগেই, দাদার সিদ্ধান্ত হয়ে গেল, এভাবে কলকাতায় বসে থাকলে কিছু হবে না। তার চেয়ে বাড়ি যাওয়াই ভাল। ওদিকেও, বাবার চিঠি এল, একটা বড় চা বাগানে, উদিতের মোটামুটি একটা ভাল চাকরি এখন হতে পারে। ভবিষ্যতে ওপরে ওঠবার সম্ভাবনা আছে।

ওপরে না, একেবারে স্বর্গে উঠে যাবে উদিত। কলকাতা ছেড়ে যাবার ওর একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। বাবা পরিষ্কার করে লেখেন নি, চা বাগানের চাকরিটা কী। চা বাগানেই যদি, চাকরি করতে হবে, তা হলে আর কলকাতায় আসবার দরকার কী ছিল। উত্তরবঙ্গে থেকে গেলেই হত।...

উদিতের গায়ে খানিকটা জলের ছিটে লাগতে, বিরক্ত হয়ে একটু সরে দাঁড়াল। দেখল, একটি মেয়ে, রেনকোট গায়ে রেখেই, ম্যাগাজিনের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে। তার কোট থেকেই, ওর গায়ে জল পড়েছে। মেয়েটি ওর দিকে একবার তাকাল মাত্র। আবার ম্যাগাজিনের ওপর ঝুঁকে পড়ল। উদিত বিরক্ত হয়ে মনে মনে বলল, 'মহারাণী এলেন। রঙচঙে রেনকোট গায়ে দিয়ে, সঙ সেজে দাঁড়িয়ে থাকবেন, তা থেকে কারোর গায়ে জল পড়লেও ভ্রূক্ষেপ নেই। যেন ওটা আর গায়ের থেকে খোলা যায় না।'

মেয়েটির দৃষ্টি পড়েছে তখন, উদিত যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার সামনের বইগুলির ওপর। সে আরো এগিয়ে এল, আর উদিত রীতিমত বিরক্ত হয়ে, অন্যদিকে সরে এসে দাঁড়াল। মেয়েটি ফিরে চেয়েও দেখল না। তার ভেজা বর্ষাতি নিয়ে এগিয়ে যাওয়াটা যেন, উদিতকে সরিয়ে দেবার জন্যই। উদিত একটু ঠোঁট বাঁকিয়ে, ঘাড় কাত করে মেয়েটির দিকে তাকাল। হাতে একটি মাঝারি ব্যাগ ছাড়া, কিছু নেই। বর্ষাতির হাতা গুটিয়ে নিয়েছে, তাই ঘড়িটা দেখা যাচ্ছে। কবজীর ঘড়িটা বেশ দামী মনে হয়। দু হাতের নখ সযত্ন লম্বিত এবং রঞ্জিত। ঠোঁটে চোখেও রঙ, চুল ঘাড় ছাড়িয়ে নিচে নামেনি। দেখতে অবিশ্যি মেয়েটি সুন্দরী বা রূপসী, সেই জাতীয়। টানা চোখ, টিকলো নাক, ফর্সা রঙ, শরীরের গঠনটিও ভাল। বয়স তেইশ চব্বিশ হবে। কিন্তু এসব পোশাক-আশাকের মেয়ে দেখলেই, উদিতের বিরক্ত লাগে। বড়লোকি ফ্যাসান। দিশি মেমসাহেব।

হঠাৎ মেয়েটি একবার ঘাড় ফিরিয়ে উদিতকে দেখল। বোধ হয়, একটি লোককে তার দিকে এতক্ষণ তাকিয়ে থাকতে দেখে, না তাকিয়ে পারল না। উদিতের আপাদমস্তক দেখল মেয়েটি। উদিত অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল, একটা সিগারেট ধরাল। মেয়েটি ইতিমধ্যে দেশী আর বিদেশী, ইংরেজী আর বাঙলা, প্রায় আধডজন ম্যাগাজিন হাতে তুলে নিয়েছে। নিয়ে, স্টলের লোকটির দিকে বাড়িয়ে দিল। লোকটি সব দেখে বলল, 'সতের টাকা বারো আনা।'

মেয়েটি ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পার্স বের করল, দুটো দশ টাকার নোট এগিয়ে দিল। খুচরো আর ম্যাগাজিনগুলো নিয়ে, চলে যাবার আগে, পিছন ফিরে স্টেশনের ঢোকবার দিকটা দেখল। মনে হল যেন, দেখার মধ্যে একটা সতর্কতা আছে। তারপরে, সবদিকেই একবার চোখ বুলিয়ে, প্ল্যাটফরমের গেটের দিকে এগিয়ে

গেল। উদিত দেখল, ওর যে-প্ল্যাটফরমে যাবার কথা মেয়েটি সেদিকেই গেল।

এই সময়েই স্টলের লোকটি বলে উঠল, 'একটু সরে দাঁড়ান মশাই।'

স্বরে স্পষ্ট বিরক্তি। উদিতের নিজেকে কী রকম অপমানিত মনে হল। ও তাড়াতাড়ি সরে গেল, আর সেই মেয়েটির ওপর রাগ হতে লাগল। নিশ্চয়ই লোকটা, ওর ওপর রেগে গিয়েছে, ও এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, একটা কাগজও কেনে নি। আর একজন ওকেই সরিয়ে দিয়ে প্রায় কুড়ি টাকার কাগজ কিনে নিয়ে গেল। উদিতের মনে হল, টাকা থাকলে ওরকম ডাঁট সবাই দেখাতে পারে। তার ওপরে আবার মেয়ে! নিশ্চয়ই নিজের আয়ের পয়সায়, ওরকম করকরে নোট বের করে, রঙীন ম্যাগাজিন কেনা যায় না। ও প্ল্যাটফরমের দিকে এগিয়ে গেল।

যা ভেবেছিল, তাই, প্ল্যাটফরমে একটু গা বাঁচিয়ে দাঁড়াবার জায়গা নেই। এখন ইলশেগুড়ি ছাট বৃষ্টি হচ্ছে। সবাই শেডের তলায় থাকবার চেষ্টা করছে। তাই ভিড় আরো বেশি। মালে মানুষে একাকার। উদিত হাত তুলে ঘড়ি দেখে অবাক হল। আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি আছে গাড়ি ছাড়তে, অথচ এখনো প্ল্যাটফরমে গাড়ি দিল না। মাইকে অনবরতই, হেঁড়ে গলায় কিছু না কিছু শোনা যাচ্ছে। কী যে বলে, উদিত কিছুই বুঝতে পারছে না, বুঝতে চায়ও না। কেবল গোলমাল খানিকটা বাড়তি মনে হচ্ছে মাইকের জন্য।

ফার্স্ট ক্লাস কোচ যেখানে থাকতে পারে, সেই মেয়েটি সেইরকম জায়গাতে দাঁড়িয়েই, মাথা নিচু করে ম্যাগাজিন দেখছে। কিন্তু এই মেঘলা দিনে, এখন তার চোখে সানগ্লাস আঁটা। চোখের জ্যোতি বোধ হয় বেশি। ঠোঁট বেঁকে উঠল উদিতের। ও আগের দিকে এগিয়ে গেল।

গাড়ি যখন ছাড়বার সময় হল, তখন প্ল্যাটফরমে গাড়ি এল। তারপরের চেহারাটা অতি কুৎসিত। ধাক্কাধাক্কি, মারামারি, চিৎকার, জায়গার জন্য ঝগড়া! উদিত দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখল। যাদের রিজারভেশন আছে তাদেরও তাড়া কম না। ও জানে, সকলের ওঠা হয়ে গেলে, কোন একটা রিজারভ ছাড়া কামরায় ধীরে সুস্থে উঠবে। বসতে পেলে ভাল, না হলে দাঁড়িয়েই যাবে। কোন এক জায়গায় গিয়ে, নিশ্চয়ই একটু জায়গা হয়ে যাবে। ওর কোন ভাবনা নেই।

কিন্তু এই মারামারি ধাক্কাধাক্কির চেহারাটা দেখল, ওর মনে হয়, কারোর জন্য কারোর কোন মায়া দয়া দায়িত্ব নেই। এই সময়টার জন্য যত বড় বড় কথা, সভ্যতা ভদ্রতা সব কোথায় যেন হারিয়ে যায়। প্রত্যেকটা মানুষকেই কেমন হিংস্র, আর একই সঙ্গে অসহায় মনে হয়।

উদিত ট্রেনের পিছন থেকে সামনে পর্যন্ত একবার টহল দিল। ফার্স্ট ক্লাসের দিকে একবার বক্র দৃষ্টি হানল। আর মনে মনে বলল, 'টাকার বড় দরকার, তা না হলে চলে না। লোকগুলো আর যাই হোক নির্ঝঞ্ঝাটে যাবে।'

তারপরে ভাবল, থার্ড ক্লাসের মেজাজ ওখানে নেই। ওখানে সবাই সবাইকে নাক সিটকোচ্ছে, সবাই সকলের থেকে বড়, কারোরই গ্যাদা ঘোচে না। সেকেণ্ড ক্লাসটা হচ্ছে সব থেকে খারাপ। নামে সেকেণ্ড ক্লাস, কিন্তু ব্যবস্থা থার্ড ক্লাসের থেকে খারাপ। বসবার জায়গা ছাড়া ওখানে রিজারভেশন হয় না। নামটাই যা একটু গালভারী, অবস্থাটা না ঘরকা না ঘাটকা। এর নাম মধ্যপন্থা, ভদ্রলোকের ভদ্রতা।

উদিত শেষপর্যন্ত একটা কামরায় উঠল। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে, তিলধারণের ঠাঁই নেই। নিজেকেই বেকুফ মনে হতে থাকে। যেখানেই তাকাও, হয় লোক বসে আছে অথবা মালপত্র

এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছে, একটুও বসবার জায়গা নেই। জিজ্ঞেস করলে এক জবাব, 'লোক আছে দাদা।'

দাদাও সেটা দেখবে, গাড়িটা ছাড়ুক। যারা আত্মীয় বিদায় দিতে এসে, জায়গা দখল করে বসে আছে, তারা নামলে কিছু জায়গা হবে। মালপত্রও গোছগাছ করে সরানো যাবে, কিছু বা কে তোলা যাবে। গাড়িটা না ছাড়লে, সুবিধা হবে না।

যে-জায়গাটা সব থেকে বেশি সন্দেহজনক মনে হল, সে-জায়গায় গিয়ে ও দাঁড়াল। একটি গোটা পরিবার, পুরো দুটো লম্বা বেঞ্চ আর দুটো বাংক দখল করে আছে। একটি দশ বারো বছরের মেয়ে একদিকে শুয়ে আছে। যেন কোলের শিশুটি ঘুমোচ্ছে। তেমনি বাংকের ওপর আট দশ বছরের একটি ছেলেও শুয়ে আছে। নিচে মাঝখানে মালপত্র। আঠারো থেকে পঞ্চাশ, মহিলার সংখ্যা চার। পুরুষ তিন, দুই প্রৌঢ়, এক যুবক। যুবকটি, বিশ বাইশ এবং আঠারো উনিশ বছর বয়স মেয়ে দুটির সঙ্গে কথা বলছে। এবং উদিতকে একবার বাঁকা চোখে দেখল। যে-দৃষ্টির বক্তব্য হল, 'এখানে সুবিধে হবে না।'

উদিত মনে মনে বলল, 'দেখা যাক গাড়িটা ছাড়ুক।'

এ সময়ে ওয়ার্নিং বেল বাজল। কামরা জুড়ে আবার ব্যস্ততা দেখা দিল। দুই প্রৌঢ়ের মধ্যে একজন ব্যস্ত হয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন, বললেন, 'চলি তা হলে রায়মশাই।'

অপরজন, 'হ্যা হ্যা, আসুন। এই জল বাদলায় এতটা কষ্ট করে···।'

'না না, তাতে আর কী হয়েছে। কই গো, এস।'

এক প্রৌঢ়া গল্প ছেড়ে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, 'হ্যাঁ, চল। সুবোধ আয়।'

উদিত হিসাব করল, তিনজন নেমে যাচ্ছে। এখন প্রণামের পালা শেষ হলে, তিনজন দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তাহলে,

আটজনের জায়গায় দাঁড়াল মহিলা তিন, (দুটি যুবতী) পুরুষ এক, খোকা খুকু দুই, সাকুল্যে ছয়। একটা জায়গা হওয়া উচিত। মনে হয়, বর্ধমান বীরভূম ছাড়িয়ে যেতে যেতে কিছু ফাঁকা হবে। যদিও সুবোধ নামক যুবকটি যাবার আগে বলে গেল, 'মেসোমশায়, আপনারা ভালভাবে জায়গা নিয়ে বসুন।'

অর্থাৎ এখানে আর কাউকে বসতে দেবেন না। উদিত আর একবার সমস্ত কামরাটা তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিল, আর কোথাও একজনের বসবার জায়গা আছে কী না। এক জায়গায় আছে, তবে সেখানে একটি বছরখানেকের শিশুকে শোয়ানো আছে। আবার ঘণ্টা বাজল। হুইসল শোনা গেল, গাড়ি দুলে উঠল। এই পরিবারটি জানলায় দাঁড়িয়ে তখনো সবাইকে বিদায় দিতে ব্যস্ত। কেবল উদিতের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে আছে, বারো আর দশের খুকু খোকা। উদিত মনের সব বাধা ঝেড়ে ফেলে, একটা ধারে বসল। জানলার ধারটা ছেড়ে দেওয়াই উচিত, কেননা এরাই যখন জায়গাটা আগে দখল করেছে।

বসতে না বসতেই রায়মশাই নামক প্রৌঢ় ভদ্রলোক হুমকে উঠলেন, 'ও মশাই ওটা আমাদের জায়গা।'

গাড়ি তখন চলছে। বারো বছরের ফ্রক পরা খুকু উঠে বসেছে। তার পাশে প্রৌঢ়া গিন্নী। দুই মেয়ে তখনো দাঁড়িয়ে, বিরক্ত চোখে উদিতকে দেখছে। খোকা বাংক থেকে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল। বোধহয় বাবাকে সাহায্য করার জন্য নেমে এল। উদিত বলল, 'আপনাদের জায়গা ছেড়েই বসেছি।'

'তার মানে ?'

উদিত সকলের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'আপনাদের ছ' জনের জায়গা ঠিকই আছে। আটজন তো এখানে ভালভাবেই বসতে পারে।'

ভদ্রলোক ক্রুদ্ধ হলেন, একই সঙ্গে অসহায়ভাবে কন্যা দুটির

দিকে তাকালেন। দুই কন্যা উদিতকে, বিরক্ত চোখে ভ্রূকুটি করল। বড় কন্যা বলল, 'এ জন্যই রিজারভেশনের দরকার হয়। তাহলে আর এসব বাজে ঝামেলা হয় না।'

পিতা বললেন, 'ঝামেলা বলে ঝামেলা, যাচ্ছেতাই। সুবোধ-টুবোধ থাকলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।'

অর্থাৎ সুবোধ থাকলে, উদিতের বসা হত না। কথা হয়তো ও বলত না, কিন্তু ইঙ্গিতগুলো সহ্য করতে না পেরে, পিতার উদ্দেশে বলল, 'রিজারভ করলে তো আটজনেই বসত। তার থেকে এ আর খারাপ কী হল বলুন।'

ভদ্রলোক আর সে কথার জবাব দিলেন না। উদিতের পাশ ঘেঁষে এমনভাবে বসলেন, যেন এখান থেকে তিনি গোটা পরিবারকে উদিতের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন, এইরকম একটা ভাব। মেয়েরা উল্টো দিকে বসল। একদিকে মা, দুই বড় কন্যা। আর একদিকে পিতার পাশে খোকা খুকু। মেয়েদের ঘাড় বাঁকানো, বিনুনি ফেরানো, ধপাস করে বসা, সমস্ত ভঙ্গির মধ্যেই, একটা বিক্ষোভ ফুটে উঠল। সকলের ভাব ভঙ্গি দেখে উদিতের অস্বস্তি হতে লাগল। ও যেন সহজভাবে বসে থাকতে পারছে না। মনে হল, এর চেয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া ভাল। কী দরকার এত মেজাজ খারাপ আর বিক্ষোভ দেখার। উদিত প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দিকে ফিরে, বেশ সহজ গলাতেই বলল, 'আর আপনাদের যদি অসুবিধে হয়, তাহলে আমি সরে গিয়ে দাঁড়াতে পারি।'

কথাটা ও এত আচমকা বলল যে, ভদ্রলোক ঠিক যেন বুঝে উঠতেই পারেন নি, কেবল শব্দ করলেন, 'অ্যাঁ?'

পরিবারের বাকীরাও অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল। ভদ্রলোক তাকালেন কন্যাদের দিকে, এবং স্ত্রীর দিকে। দুই কন্যাই কেমন যেন একটু লজ্জা পেয়ে গেল। উদিত উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। পিতা বললেন, 'না থাক, বসেছেন যখন…'

উদিত দেখল, কন্যাদের চোখে, পিতার কথার অনুমোদন ফুটে উঠল, গিন্নির মুখেও ! উদিত মনে মনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাক, পিতার এটুকু ভদ্রতাবোধ আছে। আশেপাশের বেঞ্চের যাত্রীরা একটু তাকিয়ে দেখল। অবসরে আবার সবাই যে যার কথায় মেতে গেল। সকলের কথা থেকে, উদিত বুঝতে পারল, অধিকাংশ যাত্রীর মনেই, একটা বিশেষ উদ্বেগ রয়েছে, শেষপর্যন্ত গাড়িটা তাদের গন্তব্যে নিয়ে যেতে পারবে কী না। কারণ বন্যা পরিস্থিতি মোটেই ভাল না।

এতক্ষণ কথাটা উদিতের একবারও মনে আসেনি। অথচ উত্তরবঙ্গ আর বিহারে জলস্ফীতির বিষয়, গতকালই ও একবার কাগজে দেখেছিল যেন। কিন্তু পরিস্থিতি যদি সেরকম হত, তাহলে, দাদা কি কিছু বলত না। কিংবা, দাদার হয়তো খেয়াল হয়নি। এখন ও কান পেতে যাত্রীদের কথা শুনে বুঝতে পারছে, অনেকেই বন্যার কথা বলাবলি করছে। অবিশ্যি, অধিকাংশ লোকের মনেই আশা, ব্যাপার তেমন গুরুতর না। তাহলে, ট্রেন হয়তো ছাড়ত না।

পাশ থেকে প্রৌঢ় যাত্রী বললেন, 'কৃষ্ণা, কাগজে কী লিখেছে ভাল করে দেখেছিস ?'

বিশ বাইশ বছরের মেয়েটি বলল, 'সেরকম কিছু না, তবে গঙ্গার জল যেরকম বেড়েছে, তাতে যে কোন সময়ে, একটা বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে।'

আঠারো উনিশ বলল, 'শুধু গঙ্গা নয় দিদি, ওদিকেও জল বেড়েছে। জলঢাকা তিস্তা মহানন্দা, আজকের কাগজে আছে। লিখেছে, সবাইকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।'

'আশ্চর্য, উদিত ব্যাপারটা একবারও ভাবেনি, ওর মাথাতেই আসেনি। অবিশ্যি, ও একলা যুবক, পথ চলতে কোন বিষয়েই দুশ্চিন্তা আসে না। রায়মশাই বললেন, 'তাই তো রে মীনা, আরো কয়েকদিন কলকাতায় থেকে গেলেই যেন ভাল হত।'

বলে তিনি গিন্নীর উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে তাকালেন। যার নাম মীনা, সে বলল, 'তুমিই তো ব্যস্ত হয়ে উঠলে।'

'ব্যস্ত কি আর সাধে হলাম, শুনলি তো, কৃষ্ণার আবার ...'

কথাটা শেষ করলেন না। কৃষ্ণা নাম্নী যুবতী যেন একটু রাঙা হয়ে উঠল, আর মীনা তার দিকে চেয়ে হাসল। ব্যাপারটা বোঝা গেল না। রায়মশাই আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'মেখলিগঞ্জের কথা কিছু লিখেছে কাগজে?'

কৃষ্ণা বলল, 'হ্যাঁ সেখানকার লোকদেরও যে কোন সময়েই বিপদের জন্য সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।'

রায়মশাই প্রায় অসহায়ের মত বললেন, 'বোঝ এখন।'

তারপরেই তিনি যেন একটা অবলম্বনের জন্যই, হঠাৎ উদিতকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

উদিত বলল, 'জলপাইগুড়ি।'

উদিতেরও এবার স্বাভাবিক ভাবেই একটু কৌতূহল দেখা দিল। রায় মশাইদের গন্তব্য কোথায়, সেটা ওর জানবার ইচ্ছা হল। ওকে যখন জিজ্ঞেস করেছে, তখন ওরও জিজ্ঞাসার কোনো সঙ্কোচের কারণ নেই। জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কোথায় যাবেন?'

'মেখলিগঞ্জ।'

মীনা বলে উঠল, 'কিন্তু জলপাইগুড়ির আশেপাশের অবস্থা খুব ভাল না, কাগজে সেরকম লিখেছে।'

উদিতের সঙ্গে একবার মীনার চোখাচোখি হল। উদিত রায়মশাইকে বলল, 'সেরকম বুঝলে. শিলিগুড়িতেই থেকে যাব। সেখানেও আত্মীয়স্বজনের বাড়ি আছে। কিন্তু আপনাদের মেখলিগঞ্জ যাবার কি কী, মানে ট্রেনে যাবেন না অন্য কিছুতে?'

রায়মশাই বললেন, 'আগে জলপাইগুড়িতক তো যাই, যদি ট্রেন যায়। তাহলে, সেই গাড়িতেই, একেবারে হলদিবাড়ি পর্যন্ত, তারপর সেখান থেকে বাসে করে যাব।'

মীনা বলল, 'যদি রাস্তা ডুবে গিয়ে না থাকে। তিস্তা আমাদের পার হতেই হবে। তার চেয়ে, বার্ণেসঘাটে গিয়ে, আমরা তো চ্যাংরাবান্ধা হয়েও যেতে পারি বাবা।'

রায়মশাইয়ের মুখের রেখায় উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার ছায়া ফুটে উঠল। ঘাড় নেড়ে বললেন, 'চ্যাংরাবান্ধা থেকে রাস্তা সুবিধার না।'

উদিতের মনে পড়ে গেল, একটা গানের লাইন, 'চ্যাংরাবান্ধার রেশমি চুড়ি, পাইসা পাইসা দাম। তার মধ্যে লেখা আছে, চ্যাংরাবন্ধুর নাম।'···মানে যুবক বন্ধুর নাম।

কৃষ্ণা তার বাবার উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'এত ভাবছেন কেন বাবা, কত লোক তো যাচ্ছে। সকলের যা হবে, আমাদেরও তাই হবে।'

রায়মশাই বললেন, 'সেটা ঠিক। কিন্তু দুশ্চিন্তা তো যেতে চায় না।'

উদিত এক মুহূর্ত দ্বিধা করে, একটা সিগারেট ধরাল। ওরকম বহু বয়স্ক লোকের সামনে সিগারেট খেয়ে থাকে। উদ্বেগে আর দুশ্চিন্তাতেই রায়মশাই চুপ করে থাকতে পারছেন না। একটি অল্প বয়সের যুবক তাঁর সামনে সিগারেট খাচ্ছে, সেটা তিনি চেয়েও দেখলেন না। উদিতই বরং অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। রায়মশাই ওকে জিজ্ঞেস করলেন, 'জলপাইগুড়িতে আপনাদের বাড়ি?'

উদিত মুখ ফিরিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'শহরের ওপরেই?'

'হ্যাঁ।'

'অ! কলকাতায় কি চাকরি করেন না পড়েন?'

উদিত বুদ্ধিমানের মত জবাব দিল, 'কলকাতায় দাদা থাকেন, বেড়াতে এসেছিলাম।'

রায়মশাই মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'বুঝেছি। জলপাইগুড়ি

২

শহরে কোন পাড়ায় বাড়ি, মানে অনেকেই চেনাশোনা আছে কী না। সেই জন্যই জিজ্ঞেস করছি।'

গোলমেলে প্রশ্ন। এত কথা জানবার কী দরকার। ওই ধরনের বয়স্ক লোকদের এসব বোঝানো যায় না। কৃষ্ণা সীনা যে বাবার কথায় একটু অস্বস্তি বোধ করছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু রায়মশাইয়ের মত ব্যক্তিরা এটাকে একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন হিসাবেই মনে করেন। বরং না জিজ্ঞেস করাটাই অস্বাভাবিক। উদিত বলল, 'পুরকায়স্থ পাড়ায়।'

কৌতূহলিত জিজ্ঞাসায় রায়মশাইয়ের কপালের রেখা সর্পিল হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করলেন, 'পুরকায়স্থ পাড়ায়? কার বাড়ী বলুন তো, আপনার বাবার নাম কী?'

না, লোকটা জ্বালালে। এত পরিচয় পাড়ার কী আছে? ভদ্রলোক আবার বাবার নামও জিজ্ঞেস করছেন। ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে উদিত বলল, 'বলরাম চট্টোপাধ্যায়।'

রায়মশাই একেবারে আঁক করে উঠলেন, 'অ্যাঁ, বলরামবাবুর ছেলে? বলরাম চাটুয্যে মানে আদি নিবাস পাবনায় তো?'

উদিত এটাই ভয় করেছিল। সিগারেটটা মাটিতে ফেলে, জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

রায়মশাই খুশি আর বিস্ময়ে হেসে তাঁর সমস্ত পরিবারের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর উদিতের দিকে ফিরে বললেন, 'কী আশ্চর্য, বলরামবাবু তো আমার বিশেষ পরিচিত, বলতে গেলে বন্ধু ব্যক্তি। আমি তো পুরকায়স্থ পাড়ার বাড়িতেও গেছি। আপনার—আপনি বলার কোন মানে হয় না, তুমি মেজ না সেজ।'

'মেজ।'

রায়মশাই নিজের মনেই ঘাড় নেড়ে বললেন, 'সেজটি এখনো অনেক ছোট, মাঝে তো তোমার তিন বোন আছে না?'

'দুই বোন, এক দিদির বিয়ে হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবে, তাই হবে। তোমার দিদির বিয়েতে যেতে পারিনি বটে, নেমন্তন্ন পেয়েছিলাম। তোমার মায়ের হাতের রান্না বড় ভাল।'

কথাটা মিথ্যা না, কিন্তু উদিতের খারাপ লাগছে, একজন অভিভাবক জুটে গেল দেখে। তারপরে নাম জিজ্ঞাসা, রায়মশাইয়ের নিজের পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। রায়মশাই হেসে বললেন, 'দ্যাখ দিকিনি তুমি এত চেনাশোনা বাড়ির ছেলে, আর একটু হলেই তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যাচ্ছিল।'

উদিত হেসে বলল, 'আমি ঝগড়া করতাম না।'

ওর কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। উদিত বুঝতে পারল না, এর পরে, রায়মশাই এবং রায়গিন্নিকে একটা প্রণাম করা উচিত কী না। একটা পারিবারিক পরিচয়ের কথা যখন জানাই গেল, এটাও একটা পারিবারিক নিয়মের মধ্যেই পড়ে। ওর নিজের মনের দিক থেকে কিছু যায় আসে না, প্রণাম না করলে হয়তো, রায়মশাই একটু মনে মনে কষ্ট পাবেন, অসামাজিক অভদ্র ভাববেন। অতএব, ও রায়মশাইকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল, বলল, 'পরিচয় যখন হয়েই গেল।'

রায়মশাই খুশি হয়ে, উদিতের গায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'আহা, তাতে কী হয়েছে, তাতে কী হয়েছে।'

বললেন, কিন্তু মুখে একটি সন্তুষ্ট হাসি ফুটে উঠল। রায়গিন্নিকেও প্রণাম করল উদিত। তিনি বললেন, 'আহা থাক না, বেঁচে থাক বাবা।'

রায়মশাই এবার উৎসাহের সঙ্গে তাঁর ছোট ছেলের হাত টেনে ধরে সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'খোকা, সরে বস। তুমি ভাল হয়ে বস উদিত।'

এবার উদিতেরই লজ্জা করতে লাগল। বলল, 'ঠিক আছে

ঠিক আছে।'

উদিতের হাসি কৌতুকোজ্জ্বল চোখ একবার কৃষ্ণা মীনার দিকেও পড়ল। ওরাও হাসি চাপতে পারল না। রায়মশাইও হেসে বললেন, 'এতে আর হাসির কী আছে। ওরকম একটু হয়ে যায়, না কী বল হে উদিত।'

'নিশ্চয়।'

মীনা বলল, 'সুবোধদা কী বলছিল জানেন বাবা?'

'কী?'

কৃষ্ণা হেসে ধমক দিয়ে বলল, 'যাঃ মীনা, ওকথা আবার বলে নাকি?'

মীনা বলল, 'তাতে কী হয়েছে। এখন তো জানাশোনা হয়ে গেছে।'

বলে, উদিতের দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'সুবোধদা উদিতবাবুকে দেখিয়ে বলছিল, "এ ঠিক বসবার তালে এসেছে, খবরদার বসতে দিস না"।'

আবার একটা হাসির ঝংকার বাজল। সকলেই বেশ সহজ হয়ে উঠল।

আস্তে আস্তে উদিতের আর খারাপ লাগল না। ভাবল, তবু যা হোক, একেবারে মুখ বুজে যেতে হবে না। ওর সঙ্গে অবিশ্যি দু-তিনটি বই রয়েছে পড়বার জন্য। সব মিলিয়ে এখন পরিবারটিকে ওর ভালই লাগল। রায়গিন্নি খুবই কম কথা বলেন। রায়মশাই একটু বেশি, বোধহয় এভাবেই ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

কৃষ্ণা শ্যাম বর্ণের ওপর, রোগা ছিপছিপে ভাবের। মাথায় বেশ বড় চুল আছে। বড় বড় চোখ দুটো উজ্জ্বল, কিন্তু শান্ত। তার ভাবভঙ্গিও শান্ত। মীনা সেই তুলনায়, একটু চঞ্চল, গায়ের রঙ ফরসা, চোখ তেমন বড় নয়, কিন্তু চাহনিতে একটা হাসির ছটায়,

দেখতে ভালই লাগে। বারো বছরের হেনা লাজুক, ঠাণ্ডা, কিন্তু বড় হয়ে উঠছে, সে ভাবটা ওর শরীরে, চোখেমুখে সবখানে ছড়িয়ে আছে যেন। যদিও ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বিশেষ বনিবনা হচ্ছে না। ইতিমধ্যে কয়েকবার, কোন কিছু নিয়ে, হাত টানাটানি এবং ছোটখাটো গুঁতো গাতা হয়ে গিয়েছে।

রায়মশাইয়ের কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল, উদিতের বাবার সঙ্গে, তাঁর পরিচয় অনেক দিনের। পরিচয়টা এখানে নয়, পাবনাতে থাকতেই। রায়মশাইরাও পাবনার আদি বাসিন্দা। দেশ বিভাগের পরে সকলেই উত্তর বঙ্গের নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছেন। রায়মশাইয়ের কথা থেকে আরো জানা গেল, উদিতদের যে চা-বাগানে শেয়ার আছে, ওঁরও সেখানে শেয়ার আছে, এবং এক সময়ে উদিতের বাবা এবং তিনি এক সঙ্গে পরামর্শ করেই, শেয়ার কিনেছিলেন। রায়মশাই বললেন, 'ভাগ্য ভাল সে সময়ে কষ্টে ছিষ্টে কোনরকমে শেয়ার কেনা হয়ে ছিল। তা না হলে এতদিনে সে টাকাও খরচ হয়ে যেত, কাজে কিছুই হত না। এখন তো তবু চায়ের দৌলতে, বছরে যাই হোক কিছু ঘরে আসে।'

রাইমশাইয়ের কথা শুনে, উদিতের বাবার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। ওর বাবাও মাঝে মাঝে রায়মশাইয়ের মত শেয়ারের কথা বলেন। পাবনা থেকে সব বিক্রি করে দিয়ে যখন জলপাই-গুড়িতে এসে আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল, তখনই শেয়ার কেনা হয়েছিল। অবিশ্যি তার জন্যও নাকি অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল, এবং জলপাইগুড়ির চা জগতের একজন ক্ষমতাবান বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ধরেই, শেয়ার পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। উদিত শুনেছে, সেই বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে, ওদের কিঞ্চিৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। উদিত জানে, ওর বাবাকে সেই শেয়ারের ওপর নির্ভর করেই, এক সময়ে সমস্ত সংসার এবং ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চালাতে হয়েছে। রায়মশাইয়ের কথায় বাবার কথারই প্রতিধ্বনি। এমনি নানান কথাবার্তার মধ্যে

আবার বন্যা প্রসঙ্গ এল। রায়মশাই বললেন, 'থেকে যাবার উপায় নেই, কৃষ্ণার একটা বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে কী না।'

কৃষ্ণা লজ্জা পেয়ে হেসে, মীনাকে বলল, 'দেখছিস, বাবা ঠিক গল্প করবেনই।'

উদিত মুচকে হাসল। রায়মশাই সেদিকে কান না দিয়ে বললেন, 'তোমার কী মনে হয় উদিত, গঙ্গা পর্যন্ত নিশ্চয় পার হওয়া যাবে!'

উদিত বলল, 'আমার তো তা-ই মনে হয়।'

মীনা বলে উঠল, 'বলা যায় না। কী একটা নদীর নাম করে যেন লিখছে কাগজে, কাটিহারের ওদিকে অবস্থা খুব সুবিধার না।'

উদিত বলল, 'আমি ব্যাপারটা এত তলিয়ে ভাবিই নি। দাদাও নিশ্চয় ভাবে নি, তাহলে বোধহয়, আমাকে আসতে দিত না।'

মীনা এ সময়ে উদিতের দিকে তাকিয়েছিল। চোখাচোখি হতেই চোখ সরিয়ে নিল, আর উদিতের মনে হল, মেয়েটা ওকে ভীরু জাদুগোপাল ভাবছে বোধহয়। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি লেগে রয়েছে যেন।

রায়মশাই বললেন, 'তা বটে, তোমার তো আর জরুরি দরকার কিছু নেই। দুটো দিন দেখে বেরোলেই ভাল করতে।'

উদিত বলল, 'আমার কী ভাবনা বলুন। যে কোন অবস্থাতেই আমি ঠিক চলে যেতে পারব। বান বন্যাকে আমার তেমন ভয় নেই। আপনাদেরই হবে মুসকিল—।'

উদিত কথাটা শেষ না করে, কৃষ্ণা মীনাদের দিকে একবার তাকাল। রায়মশাইয়ের মুখে উদ্বেগ যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। বললেন, 'সেই তো ভাবছি বাবা।'

মীনা উদিতের দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'মুসকিল আসানের জন্য আপনিই তো আছেন।'

উদিত অবাক হয়ে মীনার দিকে তাকাল। কৃষ্ণাকে হেসে

উঠতে দেখে, ও হাসল। রায়মশাইও হাসলেন এবং একটা আশা নিয়ে উদিতের দিকে তাকালেন।

উদিত বলল, 'তা সেরকম বিপদআপদ ঘটলে কি আর ছেড়ে যেতে পারব।'

রায়মশাই খানিকটা খুশি ও কৃতজ্ঞতায় হেঁ হেঁ করে হেসে উঠে বললেন, 'তা তো বটেই বাবা, তা তো বটেই। আমাদের বিপদ হলে কি আর তুমি ছেড়ে যেতে পারবে?'

কৃষ্ণা মীনা তুজনেই উদিতের দিকে তাকিয়েছিল। চোখাচোখি হতে মীনা যেন একটু লজ্জা পেল, ঠোঁট টিপে হাসল। বাইরে এখন বৃষ্টি নেই বটে, আকাশ মেঘলা। মাঠ ঘাট জলে থৈ থৈ করছে। বর্ষার সময়, এরকম থাকেই। তবু এ বছর বৃষ্টির যেন বাড়াবাড়ি।

উদিত কয়েকবার উঠে গিয়ে, দরজার কাছে আড়ালে সিগারেট খেয়ে এল।

উদিত বুঝতে পারছিল, মীনা ওর সঙ্গে একটু গল্প করতে চাইছে। উদিত যতোবার দরজার কাছে উঠে গিয়ে সিগারেট খেল, প্রায় প্রতিবারেই মীনাও, একটা না একটা অছিলা করে উঠে এসেছে প্রথম একবার কথা না বলে, হেসে চলে গিয়েছে। উদিতের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে গেলেই মীনার চোখে একটু রঙ ধরে যায়। উদিত নিজেকে বিদ্রূপ করেই একটু হাসল। মীনা নিশ্চয়ই, এইটুকু সময়ের মধ্যে, ওর প্রেমে পড়ে যায় নি। আসলে মীনা কৌতুকপ্রিয়। একটু কাথাবার্তা গল্প করতে ভালবাসে।

একবার মীনা বাথরুম থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল। উদিতের দিকে চোখ পড়তে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, 'খুব ফ্যাসাদে পড়ে গেছেন, না?'

উদিত প্রথমে মীনার কথাটা ঠিক ধরতে পারে নি। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ফ্যাসাদে পড়ব কেন?'

মীনা বলল, ‘এই বারে বারে দরজার কাছে উঠে এসে সিগারেট খেতে হচ্ছে।’

উদিত হাসল, বলল, ‘এতে আর ফ্যাসাদের কী আছে। এসব আমার অভ্যাস আছে।’

মীনা ঠোঁট টিপে হেসে, চোখে ঝিলিক দিয়ে বলল, ‘তবু অসুবিধে তো। বারে বারে দরজার কাছে উঠে আসতে হচ্ছে।’

উদিত বলল, ‘তা গুরুজনের সামনে যখন খেতে পারব না, তখন আর অসুবিধের কথা মনে রাখলে চলবে কেন।’

মীনা বলল, ‘এদিকে নেশা সামলানো দায়।’

উদিত হেসে বলল, ‘বোঝেন তো সবই।’

মীনা যেন চলে যাবে এ ভাবে ঘুরতে গিয়ে, আবার উদিতের দিকে ফিরে তাকালো। বলল, ‘দেখুন আরো কত ফ্যাসাদ আপনার কপালে আছে।’

উদিত বলল, ‘ফ্যাসাদ বলে মনে করলেই ফ্যাসাদ। আমি সে রকম কিছু মনে করছি না।’

মীনার চোখের ছটার মধ্যেও একটু কৃতজ্ঞতার আভাস দেখা দিল। বলল, ‘তা হলে আপনার দেখা পাওয়াটা সত্যি ভাগ্য বলে মানতে হবে।’

বাইরে থেকে জলো হাওয়ার ঝাপটা আসছে। উদিত এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, ‘কোনোরকম ফ্যাসাদে যে পড়তেই হবে, তা ভাবছেন কেন? দেখবেন হয় তো, শেষ পর্যন্ত বেশ ভালভাবেই পৌঁছে গেছেন।’

মীনা ঘাড় নেড়ে বলল, ‘কাগজে যা পড়ে দেখেছি তাতে আমার মনটা কেমন যেন খচ খচ করছে। একটা নদীর অবস্থাও কাগজে ভাল লেখে নি।’

মীনার চোখে একটু দুশ্চিন্তার ছায়া। উদিত বলল, ‘এত জেনে শুনে, বেরোলেন কেন?’

মুহূর্তেই মীনার চোখ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'শুনলেন না, দিদির একটা বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে ?'

উদিত বলে ফেললো, 'বিয়েটার সম্বন্ধ কি আর দুদিন দেরি হলে, ভেঙে যেত ?'

মীনা বলল, 'তাও যেতে পারে। আপনি ওসব বুঝবেন না।'

উদিত মীনার দিকে তাকালো। মীনা হাসল। বলল, 'মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ কি না। ছেলেদের মর্জি মাফিক চলতে হয়। তা না হলেই ভেঙে যায়।'

উদিত কোনো কথা বলল না। এসব ব্যাপার ও বোঝে না, মীনা সত্যি বলেছে। তথাপি, মীনার কথায় যেন উদিতকেও একটু খোঁচা দেবার চেষ্টা আছে। উদিত ছেলে বলেই বোধহয়।

মীনা আবার বলল, 'আর বাবার অবস্থা দেখেছেন তো। না এসে আমাদের উপায় ছিল না। কিন্তু—।'

কথাটা শেষ না করে, মীনা সকৌতুকে ভুরু বাঁকিয়ে উদিতের দিকে তাকালো। উদিতও তাকালো। মীনা বলল, 'কিন্তু আপনি কেন এই দুর্যোগ মাথায় করে বেরিয়েছেন ? আপনারো সেরকম কিছু ব্যাপার নাকি ?'

উদিত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সেরকম কিছু ব্যাপার মানে ?'

মীনা কথা না বলে হাসল। উদিত মীনার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত ভাবল। ওর মুখেও একটু বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। মীনার বক্তব্য বুঝতে ওর অসুবিধে হয় নি। বলল, 'বিয়ে করতে যাচ্ছি কী না বলছেন ?'

মীনা কথা না বলে, উদিতের চোখের দিকে তাকাল। ওর ঠোঁটে টেপা হাসি। উদিত বলল, 'ধরেছেন ঠিকই, তবে বিয়ে নয়, তার চেয়ে বড়, চাকরির জন্য যাচ্ছি।'

মীনা ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করল, 'বিয়ের থেকে চাকরিটা বড় বুঝি ?'

উদিত বলল, 'অন্ততঃ ছেলেদের বেলায়। বেকার ছেলের বিয়ে হয় না।'

মীনা মেনে নিয়ে বলল, 'তা ঠিক।'

তারপরে চলে যেতে উদ্যত হয়ে বলল, 'আবার যখন সিগারেট খেতে আসবেন, তখন আসব। এখন যাচ্ছি।'

মীনা জবাবের প্রত্যাশা না করেই চলে গেল। উদিত হাসল। মীনাকে ওর বেশ ভালই লাগছে। সহজেই কথা বলতে পারে, হাসতেও পারে। মনের ভিতরে কোনো রকম প্যাঁচ পয়জার নেই। মীনার কথা ভাবতে ভাবতে, রেখার কথা মনে পড়ে গেল। রেখাও প্রথম থেকে, এমনি অনায়াসেই সেই উদিতের সঙ্গে মিশেছিল। তবে মীনা আর রেখার মধ্যে তফাতও আছে। মীনা অল্প আলাপেই বন্ধুর মত হয়ে উঠতে চাইছে। যেন কয়েক ঘণ্টার পরিচয় নয়, তার চেয়ে বেশি। রেখা যে ওর সঙ্গে অনায়াসে মিশেছিল, তার সঙ্গে কোথায় যেন একটু অন্যরকম ভাব মিশেছিল। উদিত জানে না, সেটাকে মুগ্ধতাবোধ বলে কী না। তবে বৌদির ঠাট্টার কথাগুলো, সবই কি নিছক ঠাট্টা ছিল? দিদির এই বেকার দেবরের প্রতি, রেখার মন কি, মনে মনে একটু সীমা ছাড়িয়ে যায় নি। হয় তো সেই সীমা ছাড়িয়ে যাওয়াটা তেমন দৃষ্টিকটু বা সমস্যা হয়ে ওঠে নি।

উদিত প্রথমে ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। যেমন একদিন রেখা বাইরে বেরিয়ে বলেছিল, 'খুব মুসকিলে পড়ে গেছি।'

উদিত অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী মুসকিলে পড়লে?'

উদিত দেখেছিল, কথাটার জবাব দিতে, রেখার যেন লজ্জা করছে। ঠোঁট টিপে হেসেছিল, মাথা নিচু করেছিল, আবার উদিতের দিকে তাকিয়েছিল। বলেছিল, 'এই রোজ রোজ আপনার সঙ্গে বেড়াতে বেরুনো।'

উদিত বলেছিল, 'আমার সঙ্গে কোথায়। আমিই তো তোমার সঙ্গে বেড়াতে বেরোই।'

রেখা বলেছিল, 'একই কথা।'

উদিত বুঝতে পারে নি। জিজ্ঞেস করেছিল, 'মুসকিল কেন?'

রেখা বলেছিল, 'মুসকিল না? বিকেল হতে না হতেই রোজ বেরিয়ে পড়ি।'

উদিত রেখার মেয়েলি সঙ্কোচ এবং লজ্জার কথা বুঝতে পারে নি। মনে করেছিল, বেড়াতে বেরোতে বুঝি রেখার অনিচ্ছা। সরলভাবেই বলেছিল, 'তাহলে না বেরোলেই হয়।'

রেখা উদিতের চোখের দিকে অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকিয়েছিল। বলেছিল, 'আপনি কিছু বুঝতে পারেন না। আমার ভীষণ লজ্জা করে।'

তারপরেও উদিত জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন?'

রেখা সোজা কথা এড়িয়ে গিয়ে, ঠোঁট উল্‌টে বলেছিল, 'কী জানি।'

দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকিয়েছিল। উদিত ঠিক কিছু বুঝতে না পেরে, চুপ করেছিল। রেখাই আবার বলেছিল, 'সারাদিন মনে হয়, কখন বিকেল হবে। বাড়ির লোকেরাও বুঝতে পারে।'

উদিত বলেছিল, 'আমিও তো সারাদিন বিকেলের পথ চেয়ে বসে থাকি, কখন তুমি আসবে, কখন একটু বাড়ি থেকে বেরোব।'

রেখা আর কিছু বলে নি, কেবল উদিতের মুখের দিকে চেয়ে হেসেছিল। তারপরেই ওরা অন্য কথায় চলে গিয়েছিল। রেখা যেন মনে মনে বেশ উদ্বিগ্ন ছিল, কবে উদিতের একটা চাকরি হবে। প্রায়ই বলতো, 'চাকরিটা হচ্ছে না কেন?'

উদিত বলতো, 'দাদা জানে। আমার তো কিছু করার নেই। যা করছে, সবই দাদা করছে।'

রেখা হেসে বলতো, 'আমার উপায় থাকলে, আপনাকে একটা

চাকরি দিয়ে দিতাম।'

উদিতও হেসে বলতো, 'আমিও বেঁচে যেতাম।'

রেখার মুখ হঠাৎ হঠাৎ শুকিয়ে উঠতো। বলতো, 'এর পরে কোনদিন শুনব, আপনি কলকাতা থেকে চলে যাবেন।'

'তা চাকরি না পেলে তো চলে যেতেই হবে। দাদার ঘাড়ে আর কতদিন চেপে থাকব।'

রেখার কথা আঁকাবাঁকা। ও বলে উঠতো, 'আপনার সঙ্গে আর না মেশাই ভাল।' উদিত বুঝতে না পেরে বলতো, 'কেন, আমি কী করেছি।'

'কী আবার। কিছুই না। কলকাতায় এলেন, আমি নিয়ে বেড়ালাম, তারপরে একদিন চলে যাবেন।'

রেখার স্বরে কিছু ছিল, উদিত হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারে নি। ও রেখার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। তারপরে বলেছিল, 'সেভাবে চলে যেতে আমারো কষ্ট হবে।'

রেখা যেন অবাক হয়ে উদিতের দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ যেন একটু লজ্জাও পেয়েছিল। কেবল জিজ্ঞেস করেছিল, 'সত্যি?'

উদিত বলেছিল, 'নিশ্চয়ই।'

উদিত রেখার কথা থেকে অনুমান করে নিয়েছিল, ও কলকাতা ছেড়ে চলে গেলে, রেখার খারাপ লাগবে। তাই ও নিজের কষ্টের কথা বলেছিল। সেই শেষ পর্যন্ত কলকাতা ছেড়ে ওকে চলে যেতেই হচ্ছে।

রেখার অবর্তমানে যখন ওর কথাগুলো ভেবেছে, তখন মনে হয়েছে, বৌদির ঠাট্টাগুলো নিতান্ত ঠাট্টা না। রেখা যেন ক্রমেই একটু অন্যরকম হয়ে উঠছিল। উদিতের নিজেরও কি সেইরকম কিছু হয়েছিল। বুঝতে পারে না। তবে রেখাকে ওর ভাল লেগেছিল। সারাদিনে একবার রেখার দেখা না পেলে, ওর দিনটা যেন পূর্ণ হয়ে উঠতো না। রেখাকে দেখলেই ওর চোখ মুখ ঝলকে

উঠতো। কিন্তু একলা একলা চিন্তা ভাবনার বেশির ভাগটাই ওর চাকরির ব্যাপারটা জুড়ে থাকতো। রেখা ছিল, সারাদিনের মুক্তি।

নিজের কাছে কিছু গোপনীয়তা নেই এখন উদিত নিজেকে স্পষ্টই জিজ্ঞেস করতে পারছে, রেখাকে কি কখনো বিয়ে করার কথা ভেবেছে? না, এ কথা ওর কখনো মনে হয় নি। রেখার সঙ্গেও সহজ আর সরলভাবে মিশেছে। প্রেম বলতে যা বোঝায়, তা কখনো ওর মনে আসে নি। কিন্তু আরো দু একটি ঘটনা মনে পড়লে, রেখাকে একটু অন্যরকম মনে হয়।

বৌদির ইচ্ছাতেই, একদিন উদিত, বৌদির সঙ্গে দুপুরের শোতে সিনেমা দেখতে চলে গিয়েছিল। রেখা এসে অপেক্ষা করে নি, শুনেই চলে গিয়েছিল। তারপরে আর দুদিন আসে নি। তখন রেখাদের বাড়িটা উদিতের চেনা হয়ে গিয়েছিল। বৌদি ওকে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিল। রেখাকে সেরকম গম্ভীর আর কখনো দেখা যায় নি। যেন উদিতের সঙ্গে কথা বলতেই চাইছিল না। তারপরে যখন বাড়ির বাইরে প্রথম কথা বলেছিল, জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমাকে আগের দিন জানাতে কী হয়েছিল যে, আপনি দিদির সঙ্গে ম্যাটিনীতে সিনেমা দেখতে যাবেন।'

উদিত অসহায় বিস্ময়ে বলেছিল, 'আগের দিন কোনো কথা না হলে বলব কী করে। বৌদি খেয়ে উঠে হঠাৎ বলল, 'সিনেমায় যাবে।'

রেখা যেন অভিমানাহত গলায় বলে উঠেছিল, 'আর অমনি আপনি চলে গেলেন।'

উদিত কী জবাব দেবে, বুঝতে পারে নি। রেখা আবার বলেছিল, 'আর আমি যে আপনার জন্য আসব, সে কথা ভুলেই গেছলেন।'

কথাটা সত্যি। রেখা যে বিকেলে আসবে, সিনেমা যাবার সময়ে, সে কথা ওর মনে ছিল না। বলেছিল, 'বৌদি এমন তাড়া

লাগালো। সব থেকে ভাল হত, আপনাকেও বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গেলে।'

রেখা কথা না বলে, উদিতের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। যতক্ষণ রেখা হাসে নি, ততক্ষণ উদিতের খুব খারাপ লেগেছিল। রেখাকে গম্ভীর দেখতে মোটেই ভাল লাগে না। পরে বৌদি তার বোনকে হেসে বলেছিল, 'আমি না হয় আমার দেওরকে নিয়ে একদিন সিনেমায় গেছি। তা বলে তুই বেচারিকে দুদিন বাড়িতে বসিয়ে রাখলি কেন?'

রেখাও হাসতে হাসতেই বলেছিল, 'আমিই বা কেন খালি বাড়ি ঢুঁরে যাব?'

বৌদি তেমনি হেসেই বলেছিল, 'তোর অবস্থাটা দেখলাম।'

রেখা তাতেও বিচলিত হয় নি। বলেছিল, 'ছাখোগে। এরকম হলে, সকলেরই রাগ হয়ে যায়।'

উদিত আর একটা সিগারেট ধরালো। বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেললো। মনে মনে বলল, 'হয় তো এরকমই হয়। কিন্তু রেখা বেশ ভাল মেয়ে।' আসবার সময় রেখা যথেষ্ট হাসি খুশি থাকবার চেষ্টা করেছে। চাকরি পেলে, জলপাইগুড়িতে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করতেও বলেছে। তবে হাসি খুশির আড়ালেও, ওর মুখে একটা বিষণ্ণতা দেখা গিয়েছে। একবার উদিতকে একলা পেয়ে, হাসতে হাসতেই বলেছিল, 'দেখলেন তো, বলেছিলাম, আপনার সঙ্গে না মেশাই ভাল।'

উদিতও হেসে বলেছিল, 'ইচ্ছে করে তো আর যাচ্ছি না। আপনাদের কলকাতায় একটা চাকরি হল না তো কী করব।'

রেখা ঘাড় নেড়ে বলেছিল, 'তা জানি না। মোটের ওপর আপনার সঙ্গে মেশা ঠিক হয় নি।'

বলে রেখা সামনে থেকে চলে গিয়েছিল।

উদিত জানে, ওর চলে আশায় রেখা একজন বন্ধুকে হারাল।

তার বেশি কিছু না। এটাকে নিশ্চয়ই প্রেম বলা যায় না. উদিতের সেরকম মনোভাব কখনও আসে নি

বর্ধমান জেলা শেষ, অজয়-নদের ব্রিজের ওপর দিয়ে গাড়ি যাবার সময়, গতি অনেক কমে গেল। উদিত দেখল, অজয়ের চেহারা ভয়াল। কে যেন বলে উঠল, 'উরে বাবা রে বাবা, অজয়ের মুত্ত্তি দেখ্যা মনে লেয় কি, ই বারে আমাদের বীরভূমটা গোটা ভাইসবে।'

অজয়ের চেহারা দেখে, কথাটা মিথ্যা মনে হয় না। মনে হচ্ছে যেন, লাল রক্তের ধারা হা হা করে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। গঙ্গা আর পদ্মার অবস্থা কী হয়ে উঠেছে কে জানে। উদিত ঠিক করেছিল বোলপুরে দুপুরের খাবারের অর্ডার দেবে। কিন্তু তার আগেই. রায় পরিবারের বিশাল, লুচি তরকারি আর মিষ্টির পাহাড় বেরোল, এবং এ ক্ষেত্রে যা হয়, উদিতকে সাগ্রহে তাদের সঙ্গে খেতে বলা হল। উদিত নানাভাবে আপত্তি জানাল। সে বোলপুর থেকে ক্যাটারিং-এর ভাত নেবে, কোন অসুবিধা নেই।

তার অসুবিধা না থাকতে পারে, রায় পরিবারের সহৃদয়তা এবং আগ্রহের পক্ষে অসুবিধা। কৃষ্ণা মীনা খাবার বেড়ে দেবার ব্যবস্থা করল। মীনা প্রথমেই অতিথির হাতে কলাপাতায় খাবার তুলে দিয়ে বলল, 'আপনি বেশ স্বার্থপর লোক। আমরা খাব লুচি, আর আপনি খাবেন দুপুরে গরম গরম ভাত, আমাদের নজর লাগবে না?'

মীনার কথায় সবাই হেসে উঠল। রায়মশাই বললেন, 'তুই বড় মুখফোড় মীনা।'

উদিতকে বললেন, 'কিছু মনে করো না উদিত।'

উদিত হেসে বলল, 'না না মনে করবার কী আছে। ওঁকে আমি আগেই চিনে নিয়েছি।'

উদিতের কথায় সবাই আর একবার হেসে উঠল। কৃষ্ণার হাসিটা

এবার জোরে বেজে উঠল। স্বয়ং রায়মশাইয়ের হাসিটিও বেশ চড়া। বললেন, 'চিনে নিয়েছ তো। তা হলেই হল। তোমাকে বলব কি, মীনা আপন পর সকলের পেছনে তো লাগেই। আমার পেছনে লাগতেও কসুর করে না।'

মীনা ওর বাবার দিকে তাকিয়ে, চোখ বড় করে বলল, 'আমি আপনার পেছনেও লাগি, এ কথা বলতে পারলেন?'

রায়মশাই হেসে বললেন, 'কেন বলতে পারব না বল্। তুই তো কথায় কথায় আমার পেছনে লাগিস্। এই আজকে বেরোবার জন্য তুই আমার পেছনে কম লেগেছিলি?'

মীনার সঙ্গে আর একবার চোখাচোখি হতে, মীনার মুখে আবার রঙ লাগল। উদিত মনে মনে বলল, 'মেয়েটা পাজী আর ভাল, দুই-ই।'...

•

বীরভূম অতিক্রম করার আগেই, দু তিনবার গাড়ি দাঁড়াল। এক এক জায়গা দিয়ে, গাড়ি অত্যন্ত মন্থরভাবে চলল। সে সব জায়গায় জল প্রায় রেল লাইন ছুঁই ছুঁই করছে। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, বীরভূমের কোথাও কোথাও, ইতিমধ্যেই বন্যায় ভেসে গিয়েছে। অবস্থা মোটেই ভাল নয়। আকাশ মেঘলা। মাঝে মাঝে বৃষ্টি, মাঝে মাঝে বন্ধ। কিন্তু আবহাওয়া পুরোপুরি মেঘলা এবং বৃষ্টির।

বীরভূম ছাড়িয়ে যাবার পরে, প্রথম দুঃসংবাদ শোনা গেল, পাকুড় আর ধুলিয়ানের রাস্তা, অনেকখানি গতকালই নাকি ডুবে গিয়েছে, এবং যেটা একেবারেই আশা করা যায় নি, রাজমহলের পরে লাইন নাকি ডুবে গিয়েছে। সাধারণতঃ এ কথা কখনো শোনা যায় নি, এই অঞ্চল বন্যার বিস্তার এতটা হতে পারে। ধুলিয়ানের রাস্তা ডুবতে পারে, গঙ্গা খুব কাছেই, কিন্তু পাকুড়ের পরে রাস্তা রেললাইন ডুবে যাওয়াটা সাংঘাতিক ব্যাপার।

রায়মশাই বললেন, 'তাই যদি হয়, তবে আমি তো মনে করি, শকরিগলি ঘাট অবধি যাওয়াই হবে না। আর যদিও যাওয়া হয়, সেখানে গঙ্গার পাড়ে আটকে যাওয়া, আরো ভয়ের। জল কখন কতটা বাড়বে, কে জানে।'

কামরার মধ্যে অধিকাংশ মানুষের একই দুশ্চিন্তা। মীনার মত মেয়েও, রীতিমত উৎকণ্ঠিত। উদিত চিন্তিত। তবে একটাই ভরসা, গাড়িতে এত লোক। একলার জন্য চিন্তা করেই বা কী লাভ। কতদূর যাওয়া যায়, দেখা যাক।

পাকুড় থেকে নতুন যাত্রী প্রায় উঠলই না। বরং স্টেশনে কিছু বন্যার্তদের দেখা পাওয়া গেল, যারা এসে স্টেশনে আশ্রয় নিয়েছে। বারহাড়োয়ার কয়েকজন যাত্রী যারা উঠল, তাদের মুখে শোনা গেল, গঙ্গার ওপারে, পূর্ণিয়া ভাগলপুরের অনেক যায়গা ভেসে গিয়েছে। মহানন্দার অবস্থা খারাপ, কিষাণগঞ্জের অনেক আগেই রেললাইন নাকি ডুবে গিয়েছে। এমন কি, শোনা গেল, কাটিহার বারসই-এর মাঝখানে, কিছু রেললাইন নাকি জলমগ্ন। আর এবারের খবরও আগের মতই, রাজমহলের কাছেই রেললাইনে জল উঠেছে। তার মানে একটাই, গাড়ি আর তার বেশি যেতে পারছে না।

উদিত একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইল, তিনপাহাড় থেকে মালদহে যাবার ফেরী লঞ্চ এখনো চালু আছে কী না। জানতে পারল, এখনো আছে। ওপারে মালদহ জেলার মানিকচক সড়ক যদি ডুবে যায়, তাহলে আপনা থেকেই ফেরী বন্ধ হয়ে যাবে, এবং মানিকচক সড়কের অবস্থাও নাকি খুব ভাল না। যে কোন মুহূর্তেই ডুবে যেতে পারে। কালিয়াচকের সড়ক ইতিমধ্যেই ডুবে গিয়েছে।

উদিত ভাবতে আরম্ভ করল। এদিকে যদি আটকে যেতেই হয়, তবে গঙ্গা পেরিয়ে মানিকচক হয়ে, মালদহ পশ্চিম দিনাজপুর, কিংবা পশ্চিম দিনাজপুর দিয়ে না গিয়ে যদি পূর্ণিয়ার সড়ক দিয়ে

৩

শিলিগুড়ি পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে। অবিশ্যিই, যদি সড়কগুলোর অবস্থা ভাল থাকে।

রাজমহলে এসে স্পষ্টই বোঝা গেল, গাড়ির পক্ষে এই মুহূর্তে আর বেশী দূর যাওয়া চলবে না। আকাশ মেঘলা বটে, বৃষ্টি নেই। একটা ঝোড়ো ভাবের বাতাস আছে। আকাশের চেহারা দেখে মনে হয়, হঠাৎ বৃষ্টি আসবে না। উদিত ওর প্রস্তাবটা রায়মশাইকে জানাল। এখানেই আটকা পড়ে থাকার চেয়ে, ফেরী পেরোবার ঝুঁকি নিয়ে যদি মালদহ হয়ে যাওয়া হয়।

রায়মশাই একটু চিন্তা করলেন। তাঁর উত্তর শোনবার জন্য, পরিবারের সকলেই উৎকণ্ঠিত উৎসুক চোখে চেয়ে রইল। উদিত আবার বলল, 'অবিশ্যি যদি মালদহের যাত্রীরা যায়, তাহলেই আমরা যাব, তা না হলে যাব না।'

রায়মশাইয়ের চোখ একটু উজ্জ্বল হল। বললেন, 'তাই যদি যাই, তবে মালদহে ইংরেজবাজারে আমাদের আত্মীয় আছে, তাদের বাড়িতেই কয়েকদিন থেকে যাব।'

উদিত গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। খবর নিয়ে জানল, একটা গাড়ি তিনপাহাড়ের দিকে এখনই যাবে। কিছু মালদহগামী লোকজনের সঙ্গে ও কথা বলল। যাত্রীর সংখ্যা খুব কম না। এদের মধ্যে অনেকেই অবিশ্যি গঙ্গা পার হতে ভয় পাচ্ছে। কিন্তু পথের মাঝখানে অনিশ্চিত অবস্থায় কেউ বসে থাকতেও চাইছে না।

রায়মশাই গোটা পরিবার নিয়ে গাড়ি বদলালেন। উদিতের সাহায্য ছাড়াও, কুলিরা যতটা পারল, টাকা আদায় করল। কোন উপায়ও নেই। তিনপাহাড়ে এসে, গঙ্গার অবস্থা দেখে সত্যি ভয় লাগে। ফেরীর লঞ্চ প্রস্তুতই ছিল। লঞ্চে ওঠবার সময়ে উদিত প্রথম লক্ষ করল, হাওড়ায় স্টেশনে দেখা সেই মেয়েটিকে, স্টল থেকে

যে অনেক টাকার কাগজ কিনেছিস।

মেয়েটি তাহলে মালদহের যাত্রী। হাতে একটি বড় ব্যাগ, কাঁধে রঙচঙে বর্ষাতি, আর এক হাতে সেই কাগজগুলো। এখন আর তাকে অতটা তাজা দেখাচ্ছে না। ইতিমধ্যেই, চুল রুক্ষু হয়ে উঠেছে, মুখে উদ্বেগের ছাপ পড়েছে। একটা ব্যাপার লক্ষ করা গেল, মেয়েটি ফার্স্টক্লাসের যাত্রী হলেও, রায় পরিবারের কৃষ্ণা মীনার কাছ ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে চাইছে।

উদিত ভাবল, ও না হয় পুরুষমানুষ, বন্যা পরিস্থিতির কথা কিছু চিন্তা না করেই বেরিয়ে পড়েছে। রায়মশাইয়ের না হয় কন্যাদায়ের দুশ্চিন্তা, তাই এই ঝুঁকি নিয়ে বেরিয়ে এখন পস্তাচ্ছেন। কিন্তু এরকম একলা একটি মেয়ে, এবং বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়, বয়সটাও মোটেই বেশি না, এমন দিনে বেরোল কী করে! উদিত ভেবেছিল, শান্তিনিকেতনে বা কাছাকাছি কোথাও যাবে। ফার্স্টক্লাসের টিকেট কেটে এ যাত্রিনী যে এত দূরের পথে পাড়ি দিচ্ছে, ও একবারও বুঝতে পারে নি।

লঞ্চেই এক সময়ে উদিত দেখল, সেই মেয়েটি কৃষ্ণা মীনার সঙ্গে কথা বলছে। উদিত দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল, যদিও মীনা ওকে ঠিক চোখে রেখেছিল।

কিন্তু উদিতের দৃষ্টি নদীর দিকেই বেশি। রক্তাভ গঙ্গা যেন একটা রক্তাক্ত সমুদ্র হয়ে উঠেছে। কোথাও তার পারাপার দেখা যায় না। রেলিং-এর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে ভয় লাগে। লঞ্চের কর্মচারিদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, মানিকচকের রাস্তায় নাকি ইতিমধ্যেই জল উঠে পড়েছে। তবে, এখনো সেরকম খারাপ অবস্থা না। মোটর গাড়ি এখনো চলছে। তবে রাত্রের মধ্যে কী হবে, কিছুই বলা যায় না। এবং এও জানালো, আপাততঃ এটাই লঞ্চের শেষ ফেরী। অবস্থা ভাল না হলে, লঞ্চ আর যাতায়াত করবে না।

কিন্তু প্রায় সন্ধের মুখে, মানিকচকে পৌঁছে দেখা গেল, রাস্তায়

জল আরো বেশি উঠে গিয়েছে। মোটর বাস নেই, কোন গাড়িই কোথাও নেই। জল প্রায় হাঁটুর কাছে। রাস্তার আশেপাশের অধিবাসীরা দুপুর থেকেই, নিরাপদ জায়গার দিকে রওনা হয়ে গিয়েছে। মোটর বাসের না আসার কারণ হিসাবে শোনা গেল, আটগমের কাছে কালিন্দীর জল রাস্তায় এসে পড়েছে। মোটর বাস সেখান থেকেই ফিরে গিয়েছে।

কিন্তু মানিকচকে আটকে পড়াটা আরও বিপজ্জনক। যে কোন মুহূর্তেই জীবননাশের সম্ভাবনা। অধিকাংশ লোকই, উত্তরে মথুরাপুর বা দক্ষিণে নুরপুরের দিকে হাঁটা ধরল। একসময়ে উদিতের মনে হল, রায় পরিবার, ও নিজে আর সেই মেয়েটি ছাড়া, অধিকাংশই চলতে আরম্ভ করেছে। রায়মশাইয়ের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। কারোর মুখের দিকেই প্রায় তাকানো যাচ্ছে না। রায়মশাইয়ের ছোট ছেলে আর মেয়ে, দুজনে তো কান্নাকাটিই সুরু করে দিয়েছে। এখন উদিতের নিজেকেই কেমন যেন অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। ও রায়মশাইকে বলল, 'আমিই বোধহয় আপনাদের আরো বিপদে ফেললাম।'

রায়মশাই বললেন, 'তুমি আর কী বিপদে ফেলবে বাবা? যাঁর ফেলবার, তিনিই ফেলেছেন। তুমি নিজেও তো আর নিরাপদে নেই। এখন কী করা যায়, তাই ভাব। এভাবে তো দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।'

সবাই এক সঙ্গে, উদিতের মুখের দিকে তাকাল। যেন ও ঠিক এই বিপদে রক্ষা করতে পারবে। লজ্জিত আর বিব্রত হয়ে উঠল ও। এমন কি হাওড়া স্টেশনে দেখা সেই মেয়েটিও, উদিতের মুখের দিকে তাকাল। সমস্ত জায়গাটাকে একটা সাক্ষাত নরকের মত মনে হচ্ছে। ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আশেপাশে, জল ঠেলে ঠেলে, দু একজন লোক যাতায়াত করছে। ভাগ্য একটু প্রসন্ন বলতে হবে, বৃষ্টি হচ্ছে না। তাহলে আর দেখতে হত না।

ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে জল নেই। কয়েক পা সামনেই জল। রাস্তার খানিকটা হেঁটে গেলে, সামনে আবার রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে, যেখানে জল নেই। সেখানে আরো দু একজন লোক দেখা যাচ্ছে, অস্পষ্ট ছায়া ছায়া। উদিত বলল, 'চলুন, আমরা সবাই ওখানে যাই। আরও দু একজন রয়েছে, বোধহয় নৌকার ব্যবস্থা হচ্ছে।'

নৌকার নামে, সকলেই যেন একটু আশার আলো দেখতে পেল। কিন্তু এত মালপত্র নিয়ে চলাফেরাই দুষ্কর। মালপত্র যা কিছু সবই রায় পরিবারের। রায়মশাই বললেন, 'আমি মালপত্র নিয়ে এখানে থাকি, তুমি এদের নিয়ে ওখানে গিয়ে দ্যাখ, ব্যাপারটা কী। মনে হচ্ছে ওখানে রাস্তার ধারে এখনো কিছু বাড়িঘর বেঁচে আছে। লোকজন পাওয়া যায় কী না দেখ।'

উদিতের সেটা মন্দ মনে হল না। এই সময়ে, জলে পা দেবার আগেই, একটা গলা ভেসে এল, 'মিহির, মিহির এলি নাকি?'

সকলেই তাকিয়ে দেখল, একজন রাস্তা দিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে। উদিতের দিকে তাকিয়েই লোকটা মিহির মিহির বলে ডাকছে। উদিতের ভুরু কুঁচকে উঠল। গলাটা যেন কেমন চেনা চেনা লাগছে। শিলিগুড়ির নারায়ণের মত লাগছে। কিন্তু সেটা তো বিশ্বাস করাই কঠিন, নারায়ণ আসবে মানিকচকে। মিহির নামটাও সে হিসাবে চেনা চেনা লাগছে। যদি লোকটা সত্যিই শিলিগুড়ির নারায়ণ হয়, তাহলে মিহিরও চেনা। যদিও মিহির বলে এ দলে কেউ নেই।

মীনা বলল, 'দাঁড়ালেন কেন, চলুন।'

উদিত বলল, 'দাঁড়ান, লোকটিকে আমার চেনা চেনা লাগছে। আর একটু কাছে আসুক, দেখে নিই।'

লোকটি জল ভেঙ্গে আর একটু কাছে আসতে, উদিতের আর কোন সন্দেহ রইল না। সে বলে উঠল, 'নারাণ নাকি রে?'

আগন্তুকও অবাক হয়ে বলল, 'একি উদিত, তুই এখানে?'

উদিত বলল, 'আর বলিসনে, গঙ্গা ওদিকে মারমুখী, দেখছি এদিকেও মারমুখী। ভেবেছিলাম, এদিক দিয়ে বাইরোড যাবার চেষ্টা করব। কিন্তু তুই এখানে কী করছিস ?'

নারায়ণ ততক্ষণ কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বয়স উদিতের মতই হবে। তবে ঘাড়ে গর্দানে মোটা বলে, তাকে একটু বেশি বয়স্ক লাগছে। নারায়ণ বুঝতে পারছে না, উদিতের সঙ্গে এরা কারা। তাকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল, 'আর বলিস না মিহির আমাকে ডুবিয়েছে !'

'মিহির মানে, তোদের ড্রাইভার তো ?'

'হ্যা। এসেছিলাম ইংলিশবাজারে একটা কাজে। সঙ্গে একটা মাঝারি ট্রাক রয়েছে, কিছু মালপত্র নিয়ে এসেছিলাম। সেসব খালাস হয়ে গেছে। বন্যার কথা শুনে মিহির বলল, মানিকচক থেকে একবার ওপারে যাবে, কোথায় কাদের বাড়ি আছে, ওদের আত্মীয়, ধুলিয়ানে না কোথায় থাকে। ফিরতি লঞ্চেই খবর নিয়ে চলে আসবে বলেছিল। সেই দুপুর থেকে অপেক্ষা করছি, মিহির এখনো এল না। এদিকে জল যেভাবে বাড়ছে, এরপরে ট্রাক ফেলে রেখে আমাকে চলে যেতে হবে।'

উৎকণ্ঠায় আর উত্তেজনায়, নারায়ণ তাড়াতাড়ি অনেকগুলো কথা বলে ফেলল। আর উদিতের চোখে একটা ঝিলিক খেলে গেল। নারায়ণ আবার বলল, 'আমি যদি গাড়ি চালাতে পারতাম, তাহলে এতক্ষণে চলে যেতাম।'

উদিত প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে বলল, 'সেজন্য ভাবতে হবে না। ইংলিশবাজার অবধি যাওয়ার মত তেল মবিল আছে তো ?'

নারায়ণ প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'ওহো, উদিত, তুই তো চালাতে পারিস !'

সকলের চোখেই যেন আলো দেখা দিল। বড় বড় চোখে উদিতের দিকে তাকাল। উদিত বলল, 'সেইজন্যই বলছি। তোর

ট্রাক ঠিক আছে তো?'

'ঠিক আছে।'

'আটগমের কাছে রাস্তায় জল কী রকম হবে?'

'এই রকমই, এখানে যেরকম দেখছিস।'

উদিত জলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাহলে ঠিক আছে। ট্রাক কোথায়?'

নারায়ণ সামনের দিকে দেখিয়ে বলল, 'কাছেই। লোকগুলো দাঁড়িয়ে আছে, ওর সামনেই, বাঁকের মুখে।'

উদিত বলল, 'চল গাড়ীটা এখানে নিয়ে আসি. এদের সবাইকেই তুলতে হবে।'

নারায়ণ বলল, 'কিন্তু গাড়ী ঘোরাতে পারবি না, ব্যাক করে নিয়ে আসতে হবে।'

'তা নিয়ে আসব, চল্।'

বলে ও রায়মশাইয়ের দিকে ফিরে তাকাল। রায়মশাই উত্তেজনায় বোধহয় কাঁপছিলেন, বলে উঠলেন, 'জয় মা দুর্গতিনাশিনী। বাবা উদিত, তোমাকে আজ মা দুর্গাই মিলিয়ে দিয়েছিলেন। আর তোমার বন্ধুটিও সাক্ষাৎ নারায়ণ।'

সকলের চোখে মুখেই আশা আর হাসি ঝিলিক দিচ্ছে। রায়-মশাইয়ের প্রশস্তিতে, নারায়ণের ফর্সা প্রকাণ্ড মুখটা লাল হয়ে উঠল। সেই মেয়েটির সঙ্গে উদিতের চোখাচোখি হল। মেয়েটি যেন কিছু বলতে চাইল। তার রঙ উঠে যাওয়া ঠোঁট একবার নড়ে উঠল, কিন্তু কিছু বলতে পারল না। উদিত দেখল, মীনা ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই, মীনা ঠোঁটের কোণে হেসে, মেয়েটির দিকে চোখের কোণ দিয়ে তাকাল। উদিত বুঝতে পারল, মীনা একটু দুষ্টুমি করছে। ও নারায়ণের সঙ্গে চলে গেল।

যেতে যেতে নারায়ণের সঙ্গে উদিতের কথা হল, রায়মশাইদের সম্পর্কে। কিন্তু আর একটি মেয়ের পরিচয় ও জানে না। নারায়ণ

বলল, 'বড়লোকের মেমসাহেব মেয়ে বলে মনে হচ্ছে।'

উদিত বলল, 'তা তো বটেই। হাওড়া স্টেশনেই আমি দেখেছি।'

'হাতের বড় ব্যাগটা তো ফরেনের।'

'মেয়েটাও ফরেন মার্কা, পোশাক দেখেছিস্।'

'দেখি নি আবার। কিন্তু মেয়েটাকে আমার চেনা চেনা মনে হচ্ছে।'

উদিত ধমক দিয়ে বলল, 'ছাখ নারাণ, গুল্ মারিস না। মেয়ে দেখলেই তোর চেনা চেনা লাগে। এ মেয়ে মালদহের, তুই চিনবি কী করে।'

নারায়ণ বলল, 'তা ঠিক, কিন্তু মাইরি, মিথ্যা বলছি না. কেমন যেন চেনা চেনা মুখ লাগছে। বোধহয় কখনো শিলিগুড়িতে গেছল, তখন দেখেছি।'

'হ্যাঁ, একবার দেখেই মনে রেখে দিয়েছিস। ওসব বাদ দে, তোকে যে এভাবে পেয়ে যাব, একবারও ভাবি নি।'

'তোকেও যে পাব, ভাবি নি। আমি তো এই ফেরীটা দেখে, চলে যেতাম। আমি নিশ্চিন্ত মনে, ট্রাকে বসে আছি, ভাবছি মিহির নিশ্চয় এই ফেরীতে আসছে। তারপরে দেখছি, সবাই পালাচ্ছে, মিহির আর আসে না। তাই দেখতে এলাম একবার, যদি এই দলের মধ্যে মিহির থেকে থাকে। কিন্তু মিহিরটা এল না-ই বা কেন?'

শেষের দিকে ওর গলায়, চিন্তা ফুটে উঠল। উদিত বলল, 'আমার মনে হয়, কোনরকমে আটকে গেছে। কিন্তু ভেবে ছাখ্ নারাণ, চলে যাবি, তারপরে যদি মিহির এসে খোঁজাখুঁজি করে?'

নারায়ণ বলল, 'কোন উপায় নেই, তা হলে আর ট্রাক ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। মিহির আসে তো, কোন না কোন ভাবে চলে যাবেই। অবস্থা দেখেই বুঝতে পারবে, ট্রাক থাকলে পড়ে থাকত। আমার তো মনে হয়, আজ সারারাত্রি ট্রাক এখানে থাকলে, কাল ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।'

যোগাযোগটা সত্যি বিস্ময়কর। নারায়ণদের শিলিগুড়িতে বিরাট কনট্রাক্ট ফার্ম। সিভিল মিলিটারি দুই রকম কনট্রাক্ট বিজনেসই ওদের আছে। নারায়ণদের বাড়ি জলপাইগুড়ি, ব্যবসার ক্ষেত্র শিলিগুড়ি। শিলিগুড়িতেও তাদের বাড়ি আছে। তারা তিন ভাই শিলিগুড়িতেই থাকে। উত্তরবঙ্গ, আসাম, সমতলে এবং পাহাড়ে, সবখানেই ওদের কাজ হয়। আজ এমন দুর্দিনে যে, মানিকচকে ওদের গাড়ির দেখা পাওয়া যাবে, এটাকে দৈবঘটনা ছাড়া কিছু ভাবা যায় না।

উদিত বলল, 'আজ মনে হচ্ছে, তুই গাড়িটা না চালাতে শিখে ভালই করেছিস। তাহলে, এতক্ষণে তুই নিশ্চয় গাড়ি নিয়ে চলে যেতিস্।'

নারায়ণ বলল, 'না। চালাতে জানলেও, এই ফেরীটা দেখে যেতাম। মিহিরের জন্য শেষ অবধি দেখতাম।'

সেটাও দেখা হয়েছে। অতএব মিহিরের আর কিছু বলবার নেই।

মিহির আগেই, ট্রাকের মুখ ঘুরিয়ে রেখে গিয়েছিল। উদিত গাড়ি ব্যাক করে নিয়ে এল। গাড়ি থেকে নেমে, ও আর নারায়ণ হাত লাগিয়ে রায়মশাইদের মালপত্র নিয়ে পিছন দিকে তুলে দিল। বৃষ্টি না এলে, কোন ভাবনা নেই। বৃষ্টি এলে খোলা ট্রাকে ভিজতে হবে। মানিকচকে আটকে পড়ার থেকে, সেটা অনেক ভাল। রায় পরিবারের সবাইকে হাত ধরে টেনে তুলে দেবার পরে, সেই মেয়েটি উদিতের দিকে তাকাল। উদিতও জিজ্ঞাসু চোখে মেয়েটির দিকে তাকাল।

এখন আর বলাবলির কিছু নেই। মেয়েটি করুণ চোখে ওর দিকে চেয়ে বলল, 'আমাকে দয়া করে আপনাদের সঙ্গে একটু নিয়ে

চলুন।'

উদিতের হাওড়া স্টেশনের কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু মেয়েটির কথার স্বরে, আর মুখের চেহারা দেখে, করুণ মনে হল। বেকায়দায় পড়লে, সকলেই এরকম করে। তখন তো, মহারাণীর মত ওয়াটার প্রুফের জল দিয়ে, উদিতকে ভিজিয়ে, বই কিনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ও গম্ভীরভাবে, তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবেন আপনি?'

মেয়েটা বলল, 'আপাততঃ আপনাদের সঙ্গে একটা নিরাপদ জায়গায় তো পৌঁছনো যাক।'

রায়মশাই বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা ছাড়া উপায় কী। একলা একটি বাঙালীর মেয়ে, তাকে তো আর এখানে ওভাবে ছেড়ে চলে যাওয়া যায় না।'

বলে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তবে বাপু, ওই যা বলছিলাম, অমন সোমত্থ বয়সে, একলা বেরনো তোমার ঠিক হয় নি।'

মেয়েটি কৃষ্ণা মীনার দিকে তাকাল। ওরা দুজনেই মেয়েটির দিকে চেয়ে হাসল। ভাবখানা, বাবার কথায় কান দেবেন না। মেয়েটি বলল, 'বেরিয়ে পড়েছি, এখন আর কী করি বলুন।'

উদিত হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আসুন।'

মেয়েটি উদিতের হাত ধরল। তার আগে ব্যাগটা নারায়ণের হাতে দিল। উদিত সবাইকেই এভাবে হাতে ধরে তুলে দিয়েছে। তবু, সেই মুহূর্তেই মীনার সঙ্গে ওর চোখাচুখি হল। মীনা ঠোঁট কঁকড়ে একটু হাসল। উদিত মনে মনে বলল, 'মেয়েটা ফাজিল আছে।'

নারায়ণ ব্যাগটা মেয়েটির হাতে তুলে দেবার সময়ে, মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, বলতে পারেন, শিলিগুড়ির সঙ্গে কি কলকাতার টেলিফোন কেটে গেছে?'

নারায়ণ বলল, 'আমি যখন এসেছি, তখনো কাটেনি বলেই জানি। এতক্ষণে কী হয়েছে, বলতে পারি না।'

সবাইকে তুলে দিয়ে, উদিত আর নারায়ণ সামনে গিয়ে বসল। ড্রাইভারের সীটের পিছনের পার্টিশনের জানালা দিয়ে, পিছনটা দেখা যাচ্ছে। উদিত তাকিয়ে দেখল, কৃষ্ণা মীনার কাছেই মেয়েটি বসেছে। কথাবার্তা বলছে। এঞ্জিনের শব্দ উঠল, উদিত গাড়ি স্টার্ট দিল। এমন সময়, জনা দুয়েক লোক কোথা থেকে ছুটে এসে বলল, 'বাবু আমাদের একটু নিয়ে যান।'

'কোথায় যাবে?'

'যেখানে আপনারা নিয়ে যাবেন। এখানে আমাদের আর কিছু নেই।'

রায়মশাইয়ের গলা শোনা গেল, 'উঠে পড় তাড়াতাড়ি, এখন আর কথা বাড়িও না।'

লোক দুটো উঠে পড়ল। একজনের হাতে একটা জ্বলন্ত হ্যারিকেন ছিল। সেটা আর নেভাতে দেওয়া হল না। গাড়ি এগিয়ে চলল। নারায়ণ বারে বারেই পিছনের জানালা দিয়ে দেখছিল। তার চোখে একটা জিজ্ঞাসু কৌতূহল।

উদিত গাড়ি চালাতে চালাতেই জিজ্ঞেস করল, 'কী দেখছিস, কাকে দেখছিস এত?'

নারায়ণ কোনরকম চমকে না উঠেই বলল, 'মেয়েটিকে আমার চেনা চেনা লাগছে।'

'কোন মেয়েটিকে?'

'মেমসাহেবকে।'

'ওদের সকলের চেহারা একরকম। সাজগোজ চুলের ফ্যাশান। দেখলে মনে হয়, সবাই এক। আমি তো মেয়েটাকে প্রথমে অবাঙালী ভেবেছিলাম। কথা শুনে বুঝতে পারলাম বাঙালী।'

নারায়ণ চুপ করে রইল। মেয়েটিকে বোধহয় মনে করবার চেষ্টা

করছে। উদিত নিজেই আবার বলল, 'এমনিতে ডাঁটের শেষ নেই। দায়ে পড়ে, এখন দয়া চাইছে।'

নারায়ণ জিজ্ঞেস করল, 'তোকে ডাঁট দেখিয়েছে নাকি?'

'ওরা সবাইকে ডাঁট দেখায়।'

'কিন্তু মেয়েটাকে আমার চেনা চেনা লাগছে কেন? মনে হচ্ছে, এ মুখ আমার চেনা। কোথায় যেন দেখেছি।'

'দার্জিলিং কালিম্পং-এর হোটেলে টোটেলে কখনো দেখেছিস হয়তো।'

'হতে পারে।'

'আর না হয় তো, তোদের তো অনেক মিলিটারি আর সিভিল অফিসারদের সঙ্গে মিশতে হয়, তাদের বৌদের ভেটও দিতে হয়। সেরকম কেউ হবে।'

নারায়ণ যেন একটু আশান্বিত হল। বলল, 'সেটা হতে পারে।' বলতেই আবার ভুরু কুঁচকে উঠল। বলল, 'কিন্তু কোন বাঙালী অফিসারের বউ হলে তো সিঁথেয় সিঁদুর থাকবে। এর তা নেই।'

উদিত ঠোঁট উল্‌টে বলল, 'অফিসারের বৌয়েরা আবার সিঁদুর পরে নাকি?'

'সিঁথেয় অন্ততঃ পরে।'

'আরে রাখ্। দেখা আছে। ওই যে তোদের এক অফিসার, চক্রবর্তী, তার বৌয়ের সিঁথেয় কোনদিন সিঁদুর দেখিনি আমি। গেলাস, গেলাস মদ ওড়াতে দেখেছি।'

'মিসেস চক্রবর্তীর কথা আলাদা। ওরকম মেয়েমানুষ—।'

নারায়ণ কথাটা শেষ করল না। উদিত মুখ টিপে হাসল। বলল, 'বল্, ওরকম মনের মত মেয়েমানুষ জীবনে কোনদিন দেখিসনি। তুই তো আবার মিসেস চক্রবর্তীর সঙ্গে মজেছিস।'

নারায়ণ হাসির শব্দ করে বলল, 'যাঃ।'

'যাঃ? তোদের দুজনকেই আমি মাতাল অবস্থায় দেখেছি।'

নারায়ণ যেন লজ্জা পেয়ে বলল, 'সে হয়তো এক আধদিন—।'

'এক আধদিন? প্রায়ই তো মিসেস চক্রবর্তীকে নিয়ে তুই এদিক ওদিক পালিয়ে যাস। রাত্রি কাটিয়েও আসিস। চক্রবর্তী কিছু বলে না?'

'কী বলবে? সারাদিন মদ খায়, আর কোলা ব্যাং-এর মত পড়ে থাকে।'

'কী জীবন এদের আমি ভাবতে পারি না।'

'এদের জীবন বলে কিছু নেই।'

দুজনেই চুপ করল। রাস্তার অধিকাংশ জুড়েই জল। মাঝে মাঝে শুকনোও পাওয়া যাচ্ছে। উদিতকে প্রতিমুহূর্তেই সাবধানে চালাতে হচ্ছে। যেখানে জল, সেখানেই রাস্তা মাঠ একাকার। যে কোন মুহূর্তেই, মাঠের গভীর জলে গিয়ে পড়তে হতে পারে। খানপুর. রহিমপুর পার হওয়ার পরে, জলের গভীরতা বাড়তে আরম্ভ করেছে। পিছনের যাত্রীদের বিশেষ কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। উদিত আরো সাবধান হল। রাস্তার ধারে ধারে, যেসব গাছপালা আছে, তার সীমারেখা ধরেই, গাড়ি চালাবার চেষ্টা করছে।

আটগমের কাছাকাছি এসে, গাড়ি ঘণ্টায় তিন মাইল বেগ নিল। জল অনেক বেশি। কারবোরেটারে জল ঢুকলে আর দেখতে হবে না। গাড়ি এখানেই থেকে যাবে। দুদিকেই আম বাগান, ঘন অন্ধকার। মাঝখানে রাস্তাটা যে কোনদিক দিয়ে গিয়েছে, কিছুই বোঝা যায় না। নিরুপায় হয়ে গাড়ি দাঁড় করাতে হল। এভাবে গাড়ি চালানো যায় না।

যে-দুজন লোক পরে উঠেছিল, তারা নিজেরাই যেচে জলে নামল। দুজনের হাতেই বড় বাঁশের লাঠি। তারা বলল, 'আমাদের আলো দেখান। আমরা রাস্তার দু পাশ দিয়ে হেঁটে যাই, তাহলে নিশেন পাবেন, পিছু পিছু আসতে পারবেন। মনে হয়, গোটা একটা

মাইল এরকম রাস্তা হবে।'

কথাটা মিথ্যা না। লোক দুটো কোমর ডোবা জলে, সেইভাবে হেঁটে চলল, আর তাদের দুজনের মাঝখান দিয়ে, আস্তে আস্তে গাড়ি এগোল। প্রায় ঘণ্টাখানেক চলে, শুকনো রাস্তা পাওয়া গেল। তাদের মধ্যে একজন বলল, 'এবার নেয়ামতপুর হয়ে ইংরাজবাজার চলেন, রাস্তা বোধহয় ভালই আছে।'

কথাটা তারা মিথ্যা বলেনি। তারপরে ইংরাজবাজার পর্যন্ত রাস্তাটা ভালই পাওয়া গেল। রায়মশাই তো দুহাত তুলে আশীর্বাদ। ইংরাজবাজারে এসে, শহরের আর আলোর মুখ দেখে, সকলের মুখেই আলো দেখা দিল।

উদিত জিজ্ঞেস করল, 'কোন পাড়ায় আপনার আত্মীয়র বাড়ি?'

রায়মশাই বললেন, 'সেখানে তোমার এ গাড়ি ঢুকবে না। এখন গাড়িটা কোথায় রাখবে বল, তারপরে আমাদের সঙ্গে চল। আমাদের কাছেই তুমি থাকবে।'

উদিতের সঙ্গে নারায়ণের চোখাচোখি হল। নারায়ণ নিচু স্বরে বলল, 'মিছিমিছি থাকব কেন, চল্ রাতে রাতেই চলে যাই। রাস্তার জল বাড়বে ছাড়া তো কমবে না। কোনরকমে একবার শিলিগুড়ি পৌঁছুতে পারলে হয়।'

উদিতের তা-ই ইচ্ছা। সেই কথাই ও রায়মশাইকে বলল, 'আমরা বরং চলেই যাই। আপনারা তো এখন নিরাপদেই থাকবেন। অবস্থা ভাল হলে, ধীরে সুস্থে যাবেন।'

মীনা বলে উঠল, 'তাহলে, আমরাও আপনাদের সঙ্গে চলে যাই না কেন?'

রায়মশাই দু হাত নেড়ে বলে উঠলেন, 'না না, এই রাত করে, তোদের নিয়ে যাওয়া যায় নাকি। ওরা জোয়ান ছেলে, গাড়িটা রয়েছে।'

তবু কৃষ্ণা মীনা উদিতকে ওদের আত্মীয়ের বাড়ি খেয়ে যেতে

বলল। উদিত বলল, 'এখান থেকেই কিছু খেয়ে নেব, ভাববেন না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে চাই।'

রায় পরিবার এবং অন্য দুটি লোক নেমে গেল। কিন্তু সেই মেয়েটি তখনো বসে রয়েছে। রায়মশাই তাকে ডাকলেন, 'কই গো মা, তুমি আমাদের সঙ্গে এস।'

মেয়েটি উদিতের দিকে একবার তাকাল। উদিত বলল, 'হ্যাঁ, আপনিও এঁদের সঙ্গেই যান। আপনার কেউ আছে এখানে, কোন আত্মীয় বা চেনা-শোনা লোক।'

মেয়েটি উদ্বেগভরা চোখে ঘাড় নেড়ে বলল, 'না।'

রায়মশাই বললেন, 'তাতে কী হয়েছে, আমাদের সঙ্গেই থাকবে।'

মেয়েটি বলল, 'আপনারা শিলিগুড়ির দিকেই যাচ্ছেন। আমাকে সেদিকেই যেতে হবে। আমি আপনাদের সঙ্গে গেলে আপত্তি আছে ?'

জবাব দিলেন রায়মশাই, 'আপত্তির কারণ তো আছেই। তুমি একলা একটি মেয়ে, এই দুর্যোগের মধ্যে এদের সঙ্গে কোথায় যাবে ?'

মেয়েটি তবু উদিতের দিকে তাকিয়ে রইল। মীনা বলে উঠল, 'আপনার খালি এক কথা বাবা, উনি একলা কোথায়। ওঁরা দুজন তো আছেনই।'

রায়মশাই হতাশ বিরক্তিতে বললেন, 'তাহলে আমার কিছু বলার নেই। ওর যদি সাহস থাকে, যাবে।'

মেয়েটি মীনার দিকে সকাতর কৃতজ্ঞতায় তাকাল। তারপরে উদিতের দিকে। উদিত নারায়ণের দিকে।

নারায়ণ বলল, 'তুই কথাবার্তা বল্, আমি দু একজনের কাছে রাস্তাঘাটের খবর নিয়ে আসি।'

উদিত মেয়েটির দিকে ফিরে বলল, 'বিপদের ভয় যদি আপনার

না থাকে চলুন।'

মীনা ফোড়ন কাটল, 'আপনি আছেন কি করতে?'

'গাড়ি শুদ্ধ ডুবলে তো আর আমি বাঁচাতে পারব না।'

মীনা ঠোঁট মুচকে হেসে বলল, 'ডুবলে এক সঙ্গেই ডুববেন, কারোর কিছু বলার থাকবে না।'

কয়েকটি রিকশা ডেকে রায়মশাই মালপত্র চাপিয়ে, সপরিবারে রওনা হলেন। যাবার আগে, উদিতকে আবার আশীর্বাদ করে গেলেন। সকলেই উদিতের কাছ থেকে বিদায় নিল। মীনার ঠোঁটের হাসিটা সেইরকম। এমন কি একবার কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপিচুপি বলেও ফেলল, 'আপনাকে খুব পছন্দ হয়েছে।'

উদিত থমকে হেসে উঠেছে। মীনা খিলখিল করে হেসে উঠেছে।

সবাই চলে যাবার পরে, উদিত নারায়ণের জন্য, চারদিকে তাকাল। এ সময়ে, উদিতের চোখে পড়ল, রাস্তার এক পাশে একটা জীপ। দু তিনজন লোক, ওকে আর মেয়েটিকে দেখছে, নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করছে। হয়তো উদিতদের অবস্থা দেখেই, কিছু বলাবলি করছে। তবু, লোকগুলোর দৃষ্টি ওর ভাল লাগল না। তিনজনেই বেশ ভাল পোষাক পরে আছে। তাদের দেখলে মনে হয় না, কোনরকম দুশ্চিন্তায় আছে। তাদের প্রত্যেকের হাতেই একটা করে গেলাস। সামনেই একটা পানের দোকানে টিম টিম করে আলো জ্বলছে। লোকগুলো বোধহয় মদ খাচ্ছে। বাঙালী না অবাঙালী, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তাদের লক্ষ্য বেশি, মেয়েটির দিকেই।

মেয়েটি সেসব দেখছিল না। সে উদিতের দিকে তাকিয়ে, কিছু বলতে চাইছে। লজ্জায় বা সঙ্কোচে পারছে না বোধহয়। উদিত

এবার নিজেই জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ঠিক কোথায় যাবেন বলুন তো?'

'মাটিয়ালি।'

উদিত চমকে উঠে বলল, 'মেটুলি!'

'হ্যাঁ।'

'সে তো শিলিগুড়ি থেকেও অনেক দূর। এই দুর্যোগ দেখে, এত দূরের পথে আপনি বেরোলেন কী করে?'

'বুঝতে পারিনি।'

'সেখানে আপনার কে আছে?'

মেয়েটি যেন একটু থমকে গেল। তারপর বলল, 'আমার আত্মীয়র বাড়ি আছে।'

কথাটা উদিতের ঠিক বিশ্বাস হল না। তবে, ওর জানবার দরকারই বা কী।

ও আর কিছুই জিজ্ঞেস করল না, এমন কি মেয়েটির নামও না।

এমন সময়ে জীপের কাছ থেকে একটি লোক এগিয়ে এসে উদিতকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কোথায় যাবেন?'

লোকটির লক্ষ্য আসলে মেয়েটি, আড়চোখে সে তাকেই দেখছিল। উদিত তীক্ষ্ণ চোখে লোকটাকে দেখল। মদের গন্ধও পেল। বলল, 'কোথাও যাব কী না, এখনো বলতে পারি না।'

'গেলে কোথায় যাবেন?'

উদিত বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সে খোঁজে আপনার কী দরকার?'

লোকটি একটু নরম হবার চেষ্টা করল, 'না সেরকম হলে, আমাদের একজন আপনার ট্রাকে যেত।'

উদিত পরিষ্কার জানিয়ে দিল, 'অচেনা কোন লোককেই আমরা নেব না।'

লোকটি মেয়েটির দিকে একবার ভাল করে দেখল। বলল,

'অ! আচ্ছা, ঠিক আছে।'

কেমন যেন একটা চ্যালেঞ্জের সুর আছে লোকটার গলায়। যেতে যেতেও, বারে বারে মেয়েটির দিকে ফিরে দেখল। ওর দলের লোকেরা সবাই এদিকেই তাকিয়েছিল। লোকটা ওদের কাছে যাবার পরে, সবাই একযোগে মেয়েটির দিকে তাকাল, আর নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করতে লাগল।

উদিতের কী মনে হতে, ও মেয়েটির দিকে তাকাল। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার বলুন তো। ওরা কি আপনার চেনা লোক?'

মেয়েটি অবাক চোখে চকিতে একবার জীপ গাড়ির সামনে লোকগুলোকে দেখল। উদিতের দিকে ফিরে, ঘাড় নেড়ে বলল, 'না তো।'

উদিত আবার লোকগুলোর দিকে দেখল। ওর মনের সন্দেহ ঘুচল না। বলল, 'লোকগুলো আপনাকে ও ভাবে তাকিয়ে দেখছে কেন।'

মেয়েটির মুখ একটু রক্তাভ হল। বলল, 'তা কী করে জানব বলুন। ওদের একটা লোককেও তো আমার চেনা মনে হচ্ছে না।'

উদিত চিন্তিত হল, ওর ভুরু বেঁকে রইল। লোকগুলোকে ওর মোটেই ভাল লাগছে না। ওরা মেয়েটির দিকেই বারে বারে তাকিয়ে দেখছে। এমনিতেই দুর্যোগ, তারপরে যদি মেয়েটিকে নিয়ে, কোনো ঝামেলায় পড়তে হয়, সেটা মোটেই ভাল হবে না। লোকগুলো কারা হতে পারে, কেনই বা মেয়েটিকে এভাবে দেখছে, কে জানে। ও আবার মেয়েটির দিকে ফিরে তাকালো। মেয়েটির চোখও তখন ওর ওপরেই। চোখাচোখি হতেই, মেয়েটি চোখের পাতা নামাল। আবার তৎক্ষণাৎ উদিতের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে, আমি ওদের চিনি?'

উদিত বলল, 'তা বলছি না। তবে ওদের ধরন ধারণ যেন কী

রকম। আপনার কিছু মনে হচ্ছে না?'

মেয়েটি চকিতে আর একবার জীপের দিকে দেখল। বলল, 'হ্যাঁ, খুবই ডাউটফুল। কিন্তু কেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

উদিত বলল, 'ওদের একজন আমাদের সঙ্গে ট্রাকে যেতে চাইছে।'

মেয়েটি বলল, 'সে কথা তো শুনলাম।'

'তাতেই মনে হয়, ওদের একটা কিছু উদ্দেশ্য আছে।'

বলতে বলতেই উদিত মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'থাকলেই বা আর কী করা যাচ্ছে। দেখা যাক কী হয়।'

উদিতের কথা শুনে, মেয়েটি যেন একটু স্বস্তিবোধ করল।

বেশ খানিকক্ষণ বাদে, নারায়ণ ফিরল। ওর হাতে মস্ত বড় খাবারের ঠোঙা আর ভাঁড়। এসে বলল, 'এখানকার থানার খবর হচ্ছে, আদিনা পাণ্ডুয়া দিয়ে গাজোল পর্যন্ত রাস্তা ঠিকই আছে। শামসী পর্যন্ত রাস্তায় খানে খানে জল উঠেছে, খুব বেশি না। চাঁচলের অবস্থা খুব ভাল না, তবে পার হওয়া যেতে পারে। সেখান থেকে হয় পূর্ণিয়া ঢুকতে হবে, না হয় তো পশ্চিম দিনাজপুর দিয়ে পুর্ণিয়ায় গিয়ে পড়তে হতে পারে। পুলিশ বলছে, না যাওয়াই ভাল। এখন কী করবি?'

উদিত ভাবল খানিকক্ষণ। মেয়েটিকে একবার দেখল। বলল, 'চলেই যাই। দেখি না কী হয়।'

নারায়ণ বলল, 'আমারও তাই ইচ্ছা।'

বলে নারায়ণ এবার মেয়েটির দিকে তাকাল। উদিতকে জিজ্ঞেস করল, 'উনি তাহলে থেকে গেলেন?'

'হ্যাঁ।'

নারায়ণ বলল, 'ঠিক আছে, আপনি একটু কিছু খেয়ে নিন আমাদের সঙ্গে।'

মেয়েটি বলল, 'থাক, খেতে ইচ্ছে করছে না।'

নারায়ণ বলল, 'সে তো ইচ্ছে করবেই না। তবে মন খারাপ করে কী করবেন, যা হোক একটু খেয়ে নিন।'

ইতিমধ্যে একটা ছেলে জলের কুঁজো আর কয়েকটা গেলাস নিয়ে এল। পাতায় খাবার ভাগ করে, মেয়েটির দিকে বাড়িয়ে দিতেই, মেয়েটি বলল, 'আমাকে একটু ভেতরে গিয়ে বসতে দেবেন?'

নারায়ণ বলল, 'আসুন।'

সে দরজা খুলে দিল। মেয়েটি পাশে দাঁড়ানো উদিতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। উদিত মেয়েটির হাত ধরে নামিয়ে নিয়ে এল। বলল, 'আমার ব্যাগটা পিছনে রয়েছে।'

উদিত সে কথায় কান দিল না। মেয়েটি ভিতরে ঢুকল। নারায়ণ তার হাতে খাবার তুলে দিল।

উদিত পিছন থেকে মেয়েটির ব্যাগ তুলে নিয়ে এসে, ভিতরে তার পাশে রেখে দিল। মেয়েটি সেই মুহূর্তেই মুখে খাবার তুলতে যাচ্ছিল। যেন লজ্জা পেয়ে গেল। বলল, 'শুনুন, উদিতবাবু।'

উদিত থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'বলুন।'

'আমার দু হাতই জোড়া হয়ে গেছে। ব্যাগের ভেতরে একটা ছোট তোয়ালে আছে, একটু বের করে দেবেন?'

উদিত মেয়েটির দিকে তাকাল।

মেয়েটিও ওর দিকেই তাকিয়ে। বলে উঠল, 'বিরক্ত হচ্ছেন না তো?'

উদিত বলল, 'না, বিরক্তি আর কিসের।'

এই একটু আগেই, ট্রাকের পিছন থেকে, হাত ধরে নামিয়ে দেবার সময়ে, মেয়েটির ভঙ্গি ওর মনে পড়ে গেল।

তবু উদিত যেন খানিকটা অনিচ্ছায় ব্যাগ খুলল। ভিতর থেকে একটা সুন্দর গন্ধ বেরোল। ব্যাগের মুখের কাছে ম্যাগাজিনগুলো। তারপরেই তোয়ালে! সেটা বের করে দিল। তারপরে ও আর

নারায়ণ, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্রাকের গায়ে হেলান দিয়ে পাতার ঠোঙা থেকে খাবার খেতে লাগল।

নারায়ণ জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটার নামধাম পরিচয় কিছু জানলি?'

'না। খালি বলল, ও মেটেলি যাবে।'

'মেটেলি! তা হলে আর যাওয়া হয়েছে। কিন্তু মেটেলি কার বাড়ি যাবে?'

'বললে, কে নাকি আত্মীয় আছে।'

'তুই তো আচ্ছা ছেলে। নামধাম পরিচয়টা তো জেনে নিতে হয়।'

উদিত খেতে খেতে বলল, 'কী হবে পরিচয় জেনে? শিলিগুড়ি অবধি পৌঁছে দিলেই হল। তারপরে যে যার রাস্তায়।'

নারায়ণ বলল, 'নামটা তো অন্ততঃ জানা দরকার।'

'তোর দরকার থাকে, তুই জেনে নিস।'

নারায়ণ মুখের খাবার চিবোতে চিবোতে অদ্ভুত স্বরে বলল, 'তোর কোনো রস কষ নেই। এ রকম একটা মেয়ে সঙ্গে যাচ্ছে। কোথায় খুশি হবি, তা না, যেন ব্যোম্‌কে বসে আছিস।'

'ব্যোমকে বসে থাকব কেন। যা করবার, তা-ই করছি। তোর রস বেশি হয়ে থাকে, তুই যা খুশি তাই কর।'

উদিত তাকাল নারায়ণের দিকে। নারায়ণ মুখে খাবার নিয়ে হাসল। বলল, 'করব আবার কী। করার কিছু নেই। তবে এ রকম জানি, একটা ওরকম মেয়ে সঙ্গে থাকলে, আমার বেশ ভালই লাগে।'

উদিত অবিশ্যি একবারও বলে নি, ওর খারাপ লেগেছে। নারায়ণের কথা শুনে, ওর মনে হল, খারাপ আর কী। বাজে কোনো ঘটনা না ঘটলেই হল। নারায়ণ আবার বলল, 'মেয়েটাকে যতবারই দেখলাম, কেবল তোর দিকে চেয়ে আছে। তোকে বোধ হয় ভাল

লেগেছে।'

উদিত ভুরু কুঁচকে নারায়ণের দিকে তাকালো। নারায়ণের প্রকাণ্ড মাংসলো মুখটা দেখলে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু উদিত নারায়ণকে ভাল চেনে। ছেলেবেলার বন্ধু। এক সঙ্গে এক শহরে ওরা বড় হয়েছে, মেলামেশা করেছে। নারায়ণদের অবস্থা ওদের থেকে বরাবরই ভাল। তাতে মেলামেশা আটকায়নি। কলেজ ছেড়ে দেবার পরেও, মেশামেশিটা একরকমই আছে। উদিত বলল, 'ছাখ্ নারাণ, পেছনে লাগার তাল করিস না।'

নারায়ণ হেসে ওঠার মত শব্দ করে বলল, 'পেছনে লাগব কেন। যা সত্যি, তাই বলছি। যতবারই দেখেছি, ঠিক তোর দিকে তাকিয়ে আছে। কথাটা তোকে বলব ভেবেছিলাম।'

উদিত নারায়ণের মুখ থেকে চোখ না তুলেই বলল, 'তোকে আমি চিনি না, না?'

নারায়ণ এবার হেসে উঠল। বলল, 'মাইরি বলছি, আমি একটুও মিথ্যে বলি নি।'

উদিত বলল, 'বেশ, সত্যিই বলেছিস। তাতে কী এল গেল? মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়েছিল তো কী হল।'

'তাকানোর মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে।'

উদিত ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমার প্রেমে পড়ে গেছে।'

'তুই একটু ঝোঁক দিলেই পড়ে যাবে।'

উদিত বিরক্ত হতে গিয়ে হেসে ফেললো। নারায়ণও ওর সঙ্গে হেসে উঠল।

উদিত বলল, 'ওরে গাধা, বিপদে পড়লে ওরকম সবাই মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে। হাওড়া ইস্টিশনে কেমন ডাঁট দেখিয়েছিল, তা তো দেখিস নি।'

নারায়ণ নতুন করে উৎসাহী হয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'তাই নাকি? কী রকম?'

উদিত হাওড়া বুকস্টলের কথা বলল। নারায়ণ শুনে বলল, 'ওরকম হয়ে থাকে। ওটা ডাঁট দেখাবার জন্য নয়, এমনি আপন মনে কাগজ কিনছিল, তোর গায়ে বর্ষাতির জল লেগে গেছল।'

তারপরে মানিকচকের বান দেখে প্রেমে পড়ে গেল।

উদিত হো হো করে হেসে উঠল। তারপরে গলা নামিয়ে বলল, 'বুঝেছি, মেয়েটাকে দেখে তুই মজেছিস। তা চেষ্টা চরিত্র করে ছাখ্ না।'

নারায়ণ একরাশ খাবার মুখে পুরে দিয়ে, মুখটাকে ফুলিয়ে তুলল। খাবার চিবোতে চিবোতে হাউ হাউ করে বলল, 'এরকম চেহারার লোকের সঙ্গে মেয়েরা প্রেম করে না।'

উদিত বলল, 'তবু যদি তোকে না জানতাম। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি হিসেবে কম করে দু ডজন। মেয়ে ছাড়া তোকে আমি আজকাল ঘুরতেই দেখি না।'

নারায়ণ বলল, 'সঙ্গে ঘোরা আর প্রেম করা এক কথা না।'

উদিত ঠোঁট মুচকে হেসে বলল, 'আমি তো অন্যরকম জানি।'

'কী রকম ?'

'নারায়ণ সিন্‌হা যে-মেয়ের সঙ্গে ঘোরে, সে মেয়েই তার প্রেমিকা।'

নারায়ণ খাবার চিবোতে চিবোতে উদিতের মুখের দিকে তাকালো। চোখে তার ভ্রূকুটি অনুসন্ধিৎসা। কেবল উচ্চারণ করল, 'তার মানে ?'

উদিত বলল, 'তার মানে, মনে করে ছাখ্, এরকম কথা তুই-ই আমাকে বলেছিলি বছর খানেক আগে, নারায়ণ সিন্‌হা রোজ একটা করে প্রেম করতে পারে।'

নারায়ণ মুখের মধ্যে খাবার নিয়ে, হাঁ করে কয়েক মুহূর্ত উদিতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপরে যেন অবাক হয়ে, লজ্জা পেয়ে বলল, 'বলেছিলাম নাকি ? যাঃ, বাজে কথা।'

উদিত বলল, 'তবে স্বাভাবিক অবস্থায় বলিস নি, পেটে তখন তোর প্রচুর মাদক-দ্রব্য ছিল।'

নারায়ণ গাল ফুলিয়ে হাসবার ভঙ্গি করল। কিছু বলল না। উদিত মুখ টিপে হাসল। কথাটা ও মিথ্যা বলে নি। নারায়ণের পানের ব্যাপারে মাত্রাধিক্য ঘটলে, ওরকম অনেক কথাই সে বলে থাকে। মানুষ তার নিজের ইচ্ছা বা রুচিতেই পান করে। তথাপি পরিবেশের একটা ব্যাপার বোধহয় আছে। নারায়ণ যে-পরিবেশে থাকে, অধিকাংশ সময় চলাফেরা করে, মদ্যপানটা সেখানে নিয়মিত এবং অপ্রতিরোধ্যভাবে চলে। তাদের ব্যবসার জগতে, যা কিছু করণীয় এবং যাদের সঙ্গে উঠতে বসতে হয়, খাতির করে চলতে হয়, সেই জগতে এবং ব্যক্তিদের কাছে মদ গলা ভেজাবার পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নারায়ণ যতকাল দাদাদের সঙ্গে ব্যবসায়ে নামে নি, ততকাল তার ওসব ছিল না। আস্তে আস্তে শুরু হয়েছিল। তার আগে, ওর দাদারা শুরু করেছিল। এখন ওরা তিন ভাই এক সঙ্গে বসেই মদ্যপান করে। এটা একটা নারায়ণদের স্বাভাবিক পারিবারিক চিত্র। তবে এই চিত্র শিলিগুড়ির বাড়িতেই। জলপাইগুড়ির বাড়িতে নারায়ণের বাবা থাকেন। সেখানে ওসব নিষিদ্ধ। আজকের এই বিরাট কণ্ট্রাকটরি ব্যবসা একদা নারায়ণের বাবা-ই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখন নারায়ণের দুই দাদা আর সে সব দেখাশোনা করে। বাবা বিশ্রাম নিয়েছেন। হয়তো নারায়ণের বাবাও জানেন, তাঁর ছেলেরা পানাসক্ত। তাঁর মনোভাবটা বোধহয় এইরকম, ব্যবসা ঠিক মত বজায় রেখে, দূরে বসে ছেলেরা একটা মোটামুটি স্বাধীন জীবনযাপন করতে পারে। যদিও সেটা মাত্রাতিরিক্ত হবে না, এবং তাঁর সীমানার মধ্যেও সম্ভব নয়।

অবিশ্যি, নারায়ণদের মদ্যপানটা লুকোচুরির কিছু না। সকলেই জানে। নারায়ণ সকলের ছোট, সে হিসেবে একটু রোমান্টিক। শিলিগুড়ির যে সব পরিবারের সঙ্গে ওদের ওঠাবসা, তারা সরকারি

মিলিটারি কসমোপলিটান সমাজ। ভারতের সব প্রদেশের লোকই তার মধ্যে আছে। নারায়ণ মেয়েদের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে। ওর নিজের একটা গাড়ি আছে। টাকাও পকেটে থাকে। গুরু-দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভারটাও কম বহন করতে হয়। অতএব, আজ একে নিয়ে দার্জিলিং, কাল ওকে নিয়ে কালিম্পং, পরশু তাকে নিয়ে গ্যাংটক ছুটোছুটিতে ওর অসুবিধে নেই। অসুবিধে একটি মাত্র, আজ অবধি ভাল করে গাড়ি চালাতে শেখেনি। উদিতকে তার প্রয়োজন হয়, এই কারণেই বেশি। নারায়ণের অনেক অভিসার ভ্রমণেরই সঙ্গী উদিত।

'অভিসার' নারায়ণের ভাষায়। যে-মেয়ে ওর সঙ্গে বেড়াতে যায়, সে মেয়েই ওর প্রেমিকা। নারায়ণ নিজেও জানে, কথাটা সত্যি না। ভাবতে ভালবাসে। আসলে নারায়ণ সরল হৃদয়, ফুর্তিবাজ। কোনো কোনো সময় বোকা বলে মনে হয়। কিন্তু সে বোকা নয়। আবেগের সময় যা মনে আসে, তা-ই বলে। তখন বোকা বোকা মনে হতে পারে। কাজের বেলায় কেবল বুদ্ধিমান না, সে রঙ্গ ব্যঙ্গও জানে।

নারায়ণ আর কথা না বাড়িয়ে, চুপচাপ খেতে লাগল। ওর চোখে মুখে চিন্তার ছায়া। কিন্তু চুপ করে থাকতে পারল না। একটু পরেই আবার মুখ খুলল, 'কিন্তু যাই বলিস উদিত, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না।'

উদিত জিজ্ঞেস করল, 'কিসের ব্যাপার?'

'এই মেয়েটির কথা বলছি।'

'এখনো মেয়েটা তোর মাথায় চেপে আছে?'

'থাকছে কি আর সাধে। ভীষণ চেনা চেনা লাগছে। যতই ভাবছি, ততই মনে হচ্ছে। একে আমি কোথায় দেখেছি।'

উদিত নির্বিকারভাবে বলল, 'মেয়েটা তো আর পালিয়ে যায় নি, সঙ্গেই রয়েছে। ভাল করে আলাপ করে নে, তা হলেই হবে।'

নারায়ণ উদিতের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। তারপরে একবার গাড়ির সামনের দিকে। বলল, 'সেটাই ঠিক, চেষ্টা করে দেখতে হবে।'

উদিত সে কথার কোন জবাব দিল না। মীনার কথা হঠাৎ মনে পড়ল, 'আপনাকে খুব ভাল লেগেছে।' অর্থাৎ মেয়েটির। ফাজিল মীনা। তবে, হাওড়ায় দেখে যেরকম গর্বিতা মনে হয়েছিল, এখন সেসব কিছু নেই। বরং এবার নামিয়ে দেবার সময়, অনায়াসে, উদিতের কাঁধে হাত তুলে দিয়েছিল। এমন ঝুঁকে পড়েছিল, মেয়েটির বুক আর মুখের দিকে তাকিয়ে, ওর বুকের মধ্যে কেমন ছলাৎ করে উঠেছিল। মেয়েটি তখন ওর চোখের দিকে তাকিয়েছিল। তা-ই কী একরকম মনে হতে, পিছন থেকে ব্যাগটা এনে দিয়েছিল।

উদিত এবার জীপটা আর লোক কটাকে দেখিয়ে, নারায়ণকে জিজ্ঞেস করল, 'ওদের চিনিস নাকি?'

নারায়ণ জীপের দিকে খানিকক্ষণ দেখে বলল, 'আলো আঁধারে ঠিক বুঝতে পারছি না। একটাকে চিনি মনে হচ্ছে। শিলিগুড়ির স্মাগলার বিজয় দাশ।'

উদিত একটু আগের ঘটনাটা বলল। নারায়ণ ঘটনাটা শুনে বলল, 'পেছু নেবার মতলব থাকতে পারে। আমার কাছে রিভলবার আছে।'

উদিত বলল, 'টাকা কীরকম আছে তোর কাছে।'

'বেশি না, তিন চার হাজার ক্যাশ থাকতে পারে। তবে তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে, ওদের নজর মেয়েটার দিকে।'

ওরা দুজনেই তাকিয়ে ওদের দেখল। ভিতর থেকে ডাক শোনা গেল, 'উদিতবাবু।'

উদিত খেতে খেতে সামনের দিকে ফিরে তাকালো। মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে না, তার স্বর ভেসে এসেছে।

নারায়ণ বলে উঠল, 'তাকিয়ে দেখছিস কী। যা, তোকে ডাকছে।'

নারায়ণের ভাব দেখে উদিত ঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'তুই যা না। গ্যাখ্ না, কী বলছে।'

নারায়ণ ব্যস্ত হয়ে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই মেয়েটির গলায় যেন অস্থির রুদ্ধ ডাক শোনা গেল, 'উদিতবাবু।'

নারায়ণ এবার উদিতকে কনুই দিয়ে ঠেলা দিল। উদিত রুদ্ধ হাসি চেপে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। দেখল মেয়েটির মুখ লাল হয়ে উঠেছে। জিভে শব্দ করে বলল, 'আমাকে একটু জল দেবেন। বড্ড ঝাল লেগেছে।'

উদিত খাবারের দিকে লক্ষ্য করে দেখল, বিশেষ কিছু খেতে পারেনি। বড়লোকের মেয়ের জিভ, এসব খাবারে পোষায় না। ও বলল, 'মিষ্টি খান, কমে যাবে। জল দিচ্ছি।'

তাড়াতাড়ি নিজের খাবার শেষ করে, কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে একটা মাটির গেলাস দিল মেয়েটিকে। কয়েকবার চেয়ে চেয়ে অনেকটা জল খেল মেয়েটি। খাবারের ঠোঙাটা দেখিয়ে বলল, 'এটা কোথায় ফেলব?'

উদিত মনে মনে বলল, 'গাড়ি থেকে নেমে এসে রাস্তার ধারের নর্দমায় ফেলতে হবে।' সেসব কিছু না বলে, হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমার হাতে দিন।'

'না না, এঁটোটা আপনার হাতে দেব না। দরজাটা খুলে দিন, আমি নামছি।'

উদিত মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল। বলল, 'নামবার আর কোনো দরকার আছে?'

'না, ঠোঙা ফেলব।'

'তার জন্য আপনাকে নামতে হবে না। আমার হাতে দিন, কিছু ক্ষতি হবে না।'

মনে মনে ভাবল, মেমসাহেবি থেকে এ বাঙালিয়ানা তবু ভাল। উদিত মেয়েটির কাছ থেকে এটা আশা করেনি। মেয়েটি সঙ্কোচের সঙ্গে ঠোঙাটা বাড়িয়ে ধরল। বলল, 'আপনাকে খুব বিরক্ত করছি।'

উদিত বলল, 'ইচ্ছে করে যখন করছেন না, তখন আর বিরক্ত হব কেন?'

মেয়েটি তোয়ালে টেনে নিচ্ছিল। উদিত ফিরতে উদ্যত। ওর কথা শুনে, মেয়েটির মুখ লাল হয়ে উঠল। বলল, 'ইচ্ছে করে কেউ আবার বিরক্ত করে নাকি?'

উদিত ফিরে তাকিয়ে হাসল। মেয়েটি শুধু অবাক হয়নি, একটু আহত হয়েছে যেন। উদিত বলল, 'কেউ কেউ করে। কিন্তু আপনি তো করেন নি।'

মেয়েটি একটু হাসবার চেষ্টা করল, বলল, 'আমার খুব লজ্জা করছে। মনে হচ্ছে, আপনি বিরক্ত হয়েছেন।'

উদিত তেমনি হেসে বলল, 'আমার মুখ দেখে কি তা মনে হচ্ছে?'

দুজনেই এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। নারায়ণের গলা খাকারি ইতিমধ্যে কয়েকবার শোনা গিয়েছে। উদিত ঠিকই শুনতে পেয়েছে। মেয়েটি লজ্জিত হেসে বলল, 'বুঝতে পারছি না।'

উদিত এবার শব্দ করে হেসে উঠল।

মেয়েটি ঠোঁটের ওপর তোয়ালে বুলিয়ে বলল, 'আপনাকে বিরক্ত করলে, নিজেই বিপদে পড়ব।'

'সেটাও ভেবে রেখেছেন দেখছি।'

'ভেবে রাখব কেন, এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। বরং আপনার কাছে আমি গ্রেটফুল। আপনি হলেন রক্ষাকর্তা।'

উদিত সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে ভুরু তুলে তাকালো। বলল, 'একেবারে

রক্ষাকর্তা বলে ফেললেন ?'

পিছন থেকেই নারায়ণের গলা শোনা গেল, 'ঠিকই বলেছেন উনি। তুই না থাকলে আজ আমারই বা কী গতি হত, ওঁরই বা কী গতি হত।'

উদিত অবাক হয়ে পিছন ফিরে দেখল। নারায়ণ কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, ও টের পায় নি। বলল, 'ও তুমিও এসে গেছ ?'

নারায়ণের গোল মাংসলো মুখে হাসি আর লজ্জায় অদ্ভুত দেখাল। মেয়েটিকে লক্ষ্য করে কিছু বলতে গিয়ে, উদিতের দিকে চোখ ফেরাল। বলল, 'কথাটা কানে এল কী না, তাই না বলে পারলাম না।'

উদিত মেয়েটির দিকে দেখল। মেয়েটির চোখে মুখে রুদ্ধ হাসির ছটা। উদিতের দিকে তাকিয়ে, যেন হাসি চাপবার চেষ্টা করছে। আবার একবার ঠোঁটে তোয়ালে ছোঁয়ালো। গলায় একটু কাশির আওয়াজ করল। বলল, 'দেখছেন তো, আপনার বন্ধুও বলছেন।'

উদিত ঘাড় নেড়ে শব্দ করল, 'হুঁ।'

নারায়ণ মেয়েটির সঙ্গে আলাপের জন্য ব্যস্ত হয়েছে, উদিত বুঝতে পারল। বলল, 'ঠিক আছে, আমি রক্ষাকর্তা। শিলিগুড়ি অবধি যদি না পৌঁছুতে পারি, তখন যেন দোষ দিও না।'

একটু হেসে আবার বলল, 'তুই ওঁর সঙ্গে কথা বল্। আমি ঠোঙাটা ফেলে দিয়ে আসি।'

নারায়ণ যেন হঠাৎ লজ্জিত আর বিব্রত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমি জল খাব বলে কুঁজোটা তোর কাছে চাইছি।'

উদিত চকিতে একবার মেয়েটির মুখের দিকে দেখে নিল। ঠোঁটের ওপর তোয়ালে চাপা। শরীরটা কি কাঁপছে ? মেয়েটা হাসছে নাকি ? ও কুঁজোটা নারায়ণের হাতে তুলে দিয়ে সরে গেল। মনে মনে ভাবল, রঙ্গিনী মেয়ে। নারায়ণকে দেখে আর কথা শুনে হাসি চাপতে পারছে না। গাড়ির পিছন দিয়ে ঘুরে, নর্দমায় ঠোঙা

ফেলে দিল। ফিরে এসে দেখল, নারায়ণ কুঁজো করে, মুখ হাঁ চুউ করে জল ঢালছে। গাল গলার চাপ চাপ মাংস কাঁপছে। ঢক ঢক শব্দ, আর চিবুক এবং গলা বেয়ে, বুকে জল গড়িয়ে জামা ভিজছে। উদিত মেয়েটির দিকে তাকালো। তখনো ঠোঁটের ওপর তোয়ালে চাপা। চোখাচোখি হওয়া মাত্র, মেয়েটির গলায় একটা শব্দ শোনা গেল এবং তৎক্ষণাৎ মুখটা ফিরিয়ে নিল।

ঠিক এই মুহূর্তেই নারায়ণ কুঁজোটা নামালো। গলায় একটা আরামের শব্দ করল। উদিতেরও হাসি পাচ্ছিল, নারায়ণের জল খাওয়া দেখে। ও নিচু হয়ে, হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমার হাতে একটু জল দে নারাণ।'

নারায়ণ উদিতের হাতে জল ঢেলে দিল। তারপরে কুঁজোটা নিয়ে, উদিতও নারায়ণের মত করেই জল খেল। খেয়ে কুঁজোটা গাড়িতে তুলে দিল। বলল, 'সিগারেট দে নারাণ।'

দুজনেই সিগারেট ধরিয়ে, একটু সরে দাঁড়ালো। উদিতের চোখ পড়ল আবার জীপের সামনে লোক ক'টার ওপর। লোকগুলো এদিকেই তাকিয়ে আছে। নিজেদের মধ্যে আস্তে আস্তে কথা বলছে। একজন জীপের ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে, বোতল বের করল। ছিপি খুলে গেলাসে ঢাললো। যা অনুমান করা গিয়েছিল, তা-ই। মদ খাচ্ছে।

উদিত বলল, 'লোকগুলোর সত্যি কী মতলব থাকতে পারে? ঠ'য় এদিকেই কিন্তু তাকিয়ে আছে।'

নারায়ণ এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'মেয়েটাকে ওরা লক্ষ্য করছে।'

উদিত বলল, 'মেয়েটি তো ওদের কাউকে চেনে না।'

'মেয়েটাকে হয় তো ওরা চেনে।'

'চিনলেই বা, ও ভাবে দেখার কী আছে?'

নারায়ণ বলল, 'সেটাই ভাবছি, ওদের কী মতলব থাকতে পারে।

ওদের সামনে গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করব ?'

উদিত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না না, কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না। দেখাই যাক না, ওরা কী করে। কিন্তু তুই তো বলছিলি, একটা বিজয় দাশ না কে, স্মাগলার।'

নারায়ণ বলল, 'এখান থেকে দেখে তা-ই মনে হচ্ছে। একেবারে ডান ধারের লোকটা।'

'তার মানে গোটা দলটাই স্মাগলার।'

'তা হতে পারে।'

'কিন্তু স্মাগলিং-এর সঙ্গে মেয়েটার কী সম্পর্ক ? ওরা মেয়েটাকে দেখছে কেন ?'

নারায়ণ কোনো জবাব দিল না। উদিতও কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। আবার বলল, 'নিশ্চয়ই মেয়েটা ওদের দলের নয় ?'

নারায়ণ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'অসম্ভব !'

উদিত বলল, 'অসম্ভব কিছুই না। এর চেয়ে অনেক সুন্দরী এরিস্টোক্রাট মেয়ে শুনেছি ওসব দলে থাকে।'

নারায়ণ বলল, 'থাকতে পারে, এ মেয়েটিকে আমার তা মনে হচ্ছে না।'

উদিত চুপ করে সিগারেট খেতে লাগল। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে, সিগারেট জুতোর তলায় পিষতে পিষতে বলল, 'হলেই বা আর কী করা যাচ্ছে। যতক্ষণ কিছু একটা না ঘটছে, ততক্ষণ কিছুই করার নেই। চল্, এবার গাড়ি ছাড়া যাক।'

নারায়ণ বলল, 'পেট্রোল পাম্পটা ঘুরে যাই। স্টকে কিছু তেল আর মবিল থাকা ভাল।'

উদিত গিয়ে ড্রাইভারের সীটে বসল। মেয়েটি ওর দিকে ঘেঁষে বসেছিল। উদিত অবিশ্যি, ধরেই নিয়েছিল, রাত্রি করে একলা মেয়েটিকে আর পিছনে পাঠানো চলবে না। মেয়েটি বলল, 'আমি কিন্তু এখানেই বসতে চাই।'

নারায়ণ বলে উঠল, 'আপনি ইচ্ছা করলে, এ পাশের জানালার ধারে বসতে পারেন।'

মেয়েটি বলল, 'না থাক, এই ঠিক আছি।'

নারায়ণ উঠে, দরজা বন্ধ করল। বলল, 'উদিত গাড়ি ঘুরিয়ে নে।'

উদিত গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। নারায়ণ মেয়েটির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নামটা জানতে পারি?'

মেয়েটি যেন একটু সময় নিল, তারপরে বলল, 'আমার নাম সুতপা।'

লক্ষণীয়, পদবীটা বলল না। উদিত সিগারেট ধরাল। একটা পেট্রোল ট্যাংকের কাছে গাড়ি দাঁড় করাল। আলাদা টিনে পেট্রোল আর অন্য পাত্রে মবিল নিয়ে আবার ওদের যাত্রা। উদিতের একটু লজ্জাই করল, মেয়েটির বসার ধরন দেখে। নারায়ণের কাছ থেকে অনেকখানি সরে এসেছে। উদিতের গায়ের সঙ্গে প্রায় গা ছুঁয়ে রয়েছে। লাট্টু গিয়ারে হাত দিতে গেলেই সুতপার গায়ে লাগছে।

উদিত বলল, 'আপনার অসুবিধে হচ্ছে।'

'কিছুই না।'

উদিত বুঝতে পারছে, মেয়েটি ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ও মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করল। মীনাও ওকে চোখে চোখে রেখেছিল। যতবারই চোখ তুলে তাকিয়েছে, মীনার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে। মীনা একটা খেলা খেলছিল। দুষ্টুমির খেলা। এক একটা মেয়ে ওরকম থাকে। নজরবন্দী করে, ঠোঁট টিপে হেসে রঙ্গ করা স্বভাব। সুতপার চেয়ে থাকাটা ঠিক সেরকম না। উদিত ঘাড় ফিরিয়ে একবার নারায়ণকে দেখল। নারায়ণ এদিকেই তাকিয়েছিল। তার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি। উদিতকে চোখ নাচিয়ে কিছু ইশারা করল। উদিত তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল। সামনের দিকে তাকিয়ে, জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলবেন?'

সুতপা বলল, 'আমার একটা কথাই বারে বারে মনে হচ্ছে।'

'কী ?,

'দৈব। সত্যি বলুন তো, আপনি না থাকলে আজ কী হত ?'

এখনো সেই কথা ভাবছে সুতপা ? তার মানে, নিজের অসহায় অবস্থার কথা এখনো ভুলতে পারছে না। উদিত হাসল, বলল, 'একটা কিছু ব্যবস্থা হতই।'

সুতপা জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যবস্থা ?'

'তা কী করে জানব। কিছু একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হত।'

সুতপা এবার নারায়ণের দিকে তাকালো। নারায়ণ এদিকেই তাকিয়েছিল। সে সুতপাকে বলল, 'আমি তো আপনাকে আগেই বললাম, উদিত না থাকলে আজ আমাদের মানিকচকে ডুবে মরতে হত।'

উদিত বলে উঠল, 'বাজে কথা বলিস না।'

নারায়ণ অতি উৎসাহে বা উত্তেজনায় প্রায় তোতলা হয়ে উঠল, 'এটাকে তুই বাজে কথা বলছিস ?'

'তা ছাড়া আবার কী ? আমরা ছাড়াও মানিকচকের ঘাটে আরো লোক ছিল।'

সুতপা বলল, 'মাত্র কয়েকজন।'

নারায়ণ একই ভাবে বলে উঠল, 'আর তারা সবাই স্থানীয় লোক। কোথায় নিরাপদ জায়গা আছে, সবই জানে।'

উদিত বলল, 'তোরাও তাদের সঙ্গেই সেই নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে পারতিস।'

নারায়ণ বলল, 'হ্যাঁ, সে নিরাপদ মানে হয় তো, অন্ধকার রাত্রে কোমর ডোবা জলে দাঁড়িয়ে থাকতে হত, আর আমার এই ট্রাক কোথায় ভেসে যেত।'

'বাঁচতে গেলে মানুষকে অনেক কিছুই করতে হয়।'

উদিতের কথা শুনে, নারায়ণের মুখে হঠাৎ কোনো কথা যোগালো

না। সে যেন খানিকটা অসহায় বিরক্তিতে, সুতপার দিকে তাকালো। সুতপা একটু হাসল। বলল, 'কী জানি, আমি তো ভাবতে পারি না।'

নারায়ণ গাল ফুলিয়ে বলল, 'দূর, ওর কথা বাদ দিন।'

উদিত তা হলেই নিশ্চিন্ত হয়। সুতপা তাকালো উদিতের দিকে। কিছুক্ষণ চুপচাপ। শুধু এঞ্জিনের শব্দ।

সুতপা জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা দুজনেই শিলিগুড়িতে থাকেন?'

উদিত নারায়ণের দিকে তাকালো। নারায়ণই জবাব দিল, 'না। উদিত থাকে জলপাইগুড়িতে। আমি থাকি শিলিগুড়িতে।'

সুতপার চোখে জিজ্ঞাসা জেগে রইল। সে বোধহয় শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ির সঙ্গে দুই বন্ধুর যোগাযোগটা ধরতে পারল না।

উদিত বলল, 'ওদের আসল বাড়ি জলপাইগুড়িতেই। শিলিগুড়িতেও একটা বাড়ি আছে। ও সেখানে থাকে।'

নারায়ণ সুতপাকে বোঝাবার জন্য, তাড়াতাড়ি ধরতাই দিল, 'মানে আমাদের বিজনেস আছে কী না। কনট্রাকটারি ফার্ম, সিন্‌হা এ্যাণ্ড সন্‌স। সেটা শিলিগুড়িতেই।'

সুতপা বলে উঠল, 'সিন্‌হা এ্যাণ্ড সন্‌স তো খুব নাম করা ফার্ম।'

উদিত মনে মনে অবাক হল। এ মেয়ে তা হলে সিন্‌হা এ্যাণ্ড সন্‌সের নামও জানে। নারায়ণের মুখখানি খুশি আর বিস্ময়ে ফুলে উঠল। বলল, 'আপনি আমাদের ফার্মের কথা জানেন?'

সুতপা বলল, 'নামটা শোনা আছে।'

নারায়ণ বলল, 'মেটেলির ওদিকেও আমরা কিছু কাজকর্ম করেছি। তাতেই বোধহয় শুনেছেন।'

সুতপা বলল, 'তাই হবে বোধহয়।'

বলে মুখ ঘুরিয়ে উদিতের দিকে তাকালো। উদিত চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে, ওদের কথা শুনছে, আর ভাবছে, সুতপা ঠিক কোথাকার মেয়ে! কলকাতার না মেটেলির। এখনো ওর মনে নানান

কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা। এরকম একটি মেয়ে, একলা কলকাতা থেকে মেটেলির পথে যাত্রা করেছে। একজন জোয়ান পুরুষের পক্ষেও যেটা ভাববার কথা। এখন বলছে, সিন্‌হা এ্যাণ্ড সন্‌সের নামও তার শোনা আছে। অথচ মেটেলিতে নাকি তার আত্মীয়র বাড়ি, ত্বু একবার সেখানে গিয়েছে। তাতেই একটা ফার্মের নাম তার জানা হয়ে গিয়েছে, এবং এই দুর্যোগে সুদূর মেটেলির আত্মীয় বাড়ি চলেছে। মেলানো যায় না।

উদিতের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'এ দুর্যোগে একলা বেরোলেন কী করে?'

সুতপা যেন চমকে উঠল, শব্দ করল, 'অ্যাঁ?'

নারায়ণ তাড়াতাড়ি যোগ দিল, 'হ্যাঁ, আমিও ভাবছিলাম, এই দুর্যোগের মধ্যে আপনি কী করে বেরোলেন?'

সুতপা যেন সহসা কোনো জবাব পেল না। বলল, 'মানে এই —সবাই যেমন বেরিয়ে পড়েছে, সেইরকম ভাবেই বেরিয়ে পড়েছি।'

নারায়ণই আবার জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ি থেকে আপনাকে এভাবে একলা বেরোতে দিল?'

সুতপা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, 'না, মানে—।'

উদিত বলে উঠল, 'খুব জরুরি দরকারে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে, না?'

সুতপা যেন জবাব খুঁজে পেল, 'হ্যাঁ, ভীষণ জরুরি দরকারে বেরিয়ে পড়তে হল।'

নারায়ণ গোল মুখে হা করে বলল, 'তা বলে একলা একলা, আপনার মত একটি মেয়ে—মানে একজন অল্পবয়সী মহিলা?'

উদিতের ঠোঁটের কোণ বেঁকে উঠল। সুতপা বলল, 'আমি তো একলা একলা বেরোই।'

নারায়ণের তথাপি জিজ্ঞাসা, এত দূরের রাস্তায়, এইরকম দুর্যোগে?'

নারায়ণ গোল চোখ তুলে, হা করে তাকিয়ে রইল। সুতপা বলল, 'আগেও তো এরকম বেরিয়েছি।'

নারায়ণ তবু হা করে তাকিয়ে রইল। সুতপা আবার বলল, 'বাড়ির লোকেরা বুঝতে পারে নি, এদিকে এরকম বন্যা হচ্ছে।'

উদিত হেসে উঠল। সুতপা ওর দিকে ফিরে তাকালো। জিজ্ঞেস করল, 'হাসলেন যে?'

উদিত বলল, 'হাসি পেয়ে গেল। আপনার কথায় না, নারায়ণকে দেখে।'

সুতপা বিব্রত কিন্তু চোখে সন্দেহ। সে উদিতের মুখ থেকে চোখ সরাল না। উদিত সেটা বুঝতে পারছে। ওর ঠোঁটের কোণে হাসিটা লেগে আছে। বেশ বুঝতে পারছে, যে কোনো কারণেই হোক সুতপা সত্যি কথা বলতে পারছে না। নারায়ণ সেটা একেবারেই ধরতে পারে নি, উত্তরোত্তর বিস্ময়ে আর কৌতূহলে কেবল, চোখ গোল করে, মুখের হা বাড়িয়ে তুলছে।

উদিত একবার সুতপার দিকে দেখল। বলল, 'আসলে আপনার যে জরুরি দরকার ছিল। নারাণ সেটা বুঝতে পারছে না।'

সুতপা ঘাড় কাত করে, মাথাটা পেছিয়ে নিয়ে এসে, উদিতের দিকে তাকালো। সহসা কিছু বলল না। ঠোঁট টিপে রইল। উদিত মুখ না ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলবেন?'

সুতপা বলল, 'আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন?'

উদিত ভুরু কুঁচকে বলল, 'কিসের সন্দেহ বলুন তো।'

সুতপা বলল, 'আমি বাজে কথা বলেছি?'

উদিতের হাসিটা প্রবল হয়ে উঠতে চাইল। কিন্তু ও হাসি চাপল। বলল, 'না না, সেরকম সন্দেহ করব কেন। আমি বলছি, আপনার যে ভীষণ জরুরি দরকার ছিল বেরোবার, সেটা নারাণ বুঝতে পারে নি। তাই না নারাণ?'

উদিত নারায়ণের দিকে তাকালো। নারায়ণ যেন সুতপা উদিতের

কথাবার্তা ঠিক বুঝতে পারছিল না। ওর গলা দিয়ে একটা জিজ্ঞাসাসূচক শব্দ বেরোল মাত্র, 'অ্যাঁ ?'

সুতপা উদিতের দিকে চোখ রেখে বলে উঠল, 'জরুরি দরকার না থাকলে কেউ এভাবে বেরোয় ?'

উদিত মুখের হাসি বজায় রেখেই বলল, 'আমি তো সে কথাই বলছি।'

সুতপা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, 'না, আপনি সে কথা বলছেন না।'

উদিত সামনের দিকে চোখ রেখে, চুপ করে রইল। কোনো কথা বলল না।

সুতপার গলায় কি ঝাঁজ রয়েছে ? ধরা পড়ে গেলে বোধহয়, সকলের অবস্থা এরকমই হয়। ওর ঠোঁটের কোণের হাসিটা মিলিয়ে গেল না। সুতপার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, সে সব জেনে শুনেই, এ অবস্থায় বেরিয়েছে। তেমন একটা জরুরি দরকার না থাকলে, বা বিপদে না পড়লে, এভাবে একলা একটি মেয়ে বেরোয় না। সুতপার কথা থেকেই এখন সেটা পরিষ্কার।

তথাপি সুতপা নারায়ণের প্রশ্নে বিব্রত বোধ করছিল। জবাব দিতে তার অস্বস্তি হচ্ছিল। নারায়ণকে সে বোঝাবার চেষ্টা করছিল, কিছু না জেনে শুনেই বেরিয়ে পড়েছে। পথের মাঝখানে এসে বিপদে পড়ে গিয়েছে। আসল কথাটা বলতে পারছিল না। সে জন্যই উদিতের হাসি পেয়েছে। অবিশ্যি আসল কথা এখনো কিছুই সুতপা বলে নি। সেটা জানবার দরকারই বা কী।

উদিত আস্তে আস্তে মুখ ঘুরিয়ে সুতপার দিকে তাকালো। সুতপা ওর দিকেই তাকিয়েছিল। রুক্ষ চুলের গোছা কপালে এসে পড়েছে। তার আয়ত চোখের তারায়ও যেন ঝাঁজ ফুটে রয়েছে। উদিত বলল, 'আমি সে কথাই বলতে চেয়েছি। ভীষণ একটা দরকার না থাকলে, আপনি এরকম একটা ঝুঁকি নিতেন না। নিতেন কী ?'

সুতপার ঘাড়ে আবার একটা ঝাঁকুনি লাগল, বলল, 'নিতাম না-ই তো।'

'আমি তো সে কথাই বলছি।'

সুতপার চোখে সেই তীক্ষ্ণ সন্দেহ এবং অনুসন্ধিৎসা। কিছু না বলে কেবল উদিতের দিকে চেয়ে রইল। নারায়ণ যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে, গোল গোল চোখে দুজনকে দেখতে লাগল। বলে উঠল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

উদিতের ঠোঁটের কোণ আর একটু বিস্ফারিত হল। সুতপার চোখের তারা কাঁপল। উদিত আবার সুতপার দিকে ফিরল। বলল, 'আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

সুতপার ভুরু কুঁচকে উঠল। বলল, 'আমার মনে হয়। সেটা আপনিই আমাকে বুঝছেন।'

উদিত সামনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো। বলল, 'একেবারেই না। আমি আপনাকে একটুও ভুল বুঝিনি। আপনি বাজে কথা বলেছেন বলে, আমি একবারও ভাবিনি।'

সুতপাকে শান্ত করার জন্যই, উদিতকে একটু মিথ্যা কথা বলতে হল। ও জানে, সুতপা একটা কিছু চাপতে চাইছে বলেই, এভাবে বেরিয়ে পড়ার নানান সাফাই গাইছে। আসলে সুতপার এ অবস্থাটা অসহায় আর করুণ। ও হাসিটা দমন করল, একটু গম্ভীর হয়ে উঠতে চাইল।

সুতপা নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। কোনো কথা বলল না। সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। গাড়ির মধ্যে চুপচাপ, কেবল এঞ্জিনের শব্দ। ড্যাশ বোর্ডের ফিকে আলোয়, তিন জনের মুখই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। স্পীডোমিটারের কাঁটা, নব্বুই থেকে একশো কিলোমিটারে ওঠা নামা করছে।

উদিত বুঝতে পারছে, নারায়ণ ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার মুখের ভাবটা দেখবার জন্য উদিত একবার মুখ ফেরাল। ফিরিয়ে

অবাক হয়ে দেখল, নারায়ণের মোটা ঠোঁটের হাসি। চোখাচোখি হতেই, সে চোখের পাতা নাচালো, এবং ইশারায় একবার সুতপাকে দেখলো। উদিত তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল। বোঝা গেল, নারায়ণ একটা কোনো রসাত্মক সিদ্ধান্তে এসেছে।

সুতপা কি সত্যি সত্যি রেগে গেল নাকি? তার মত কেতাদুরস্ত মেয়ে এত সহজে নিজের রাগ প্রকাশ করবে? তাও এত অল্প পরিচিত লোকের কাছে? সেটা যেন কেমন একটু বেমানান।

নারায়ণের গলা শোনা গেল, 'মিস্—মিস্—।'

সুতপা নারায়ণের দিকে ফিরে তাকালো, 'আমাকে বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি মজুমদার।'

নারায়ণ বলল, 'মিস মজুমদার, আপনি কি রাগ করেছেন?'

সুতপা যেন সহসা ঘুম থেকে জেগে উঠল। আয়ত্ত চোখ বড় করে বলল, 'আমি রাগ করব কেন? রাগ করিনি তো।'

নারায়ণ বলল, 'হঠাৎ যে রকম চুপ করে গেলেন।'

সুতপা বলল, 'না, আমার ঘুম পাচ্ছে।'

নারায়ণ শব্দ করল, 'ও!'

সুতপা উদিতের দিকে একবার দেখল। তারপরে নারায়ণের দিকে ফিরে বলল, 'আপনার বন্ধু রাগ করেছেন কী না দেখুন।'

উদিত ঘাড় ফিরিয়ে সুতপার দিকে দেখল। সুতপার মুখে হাসি ফুটেছে। চোখের তারায় ঝিলিক। ও বলল, 'আমি রাগ করব কেন শুধু শুধু।'

সুতপা বলল, 'করেন নি তো?'

উদিত পাল্টা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি সত্যি করেন নি তো?'

সুতপা বলল, 'না। একটু মন খারাপ হয়ে গেছল।'

উদিত সুতপার চোখাচোখি হল। সুতপা ঠোঁট টিপে হাসল। সে যে নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিয়েছে, উদিত বুঝতে পারল।

ও নারায়ণের দিকে দেখল। নারায়ণ চোখের পাতা নাচিয়ে ইশারা করল। তার প্রেমে ভরা মনে একটা জোয়ার লেগেছে বোঝা গেল। সে বলে উঠল, 'রাগ জিনিসটা সব সময় খারাপ না।'

উদিত শঙ্কিত হল। নারায়ণ কোন দিকে যেতে চাইছে। সুতপা জিজ্ঞেস করল, 'কী রকম।'

নারায়ণ একটু টেনে টেনে হাসল। বলল, 'রাগের সঙ্গে অনুরাগ থাকলে, রাগটা খারাপ নয়।'

উদিত এটাই আশঙ্কা করেছিল, নারায়ণ এ ধরনের একটা মোটা রসিকতা কিছু করে বসবে। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'থাক হয়েছে, তোকে আর রাগের তত্ত্ব বলতে হবে না।'

সুতপা তার সারা শরীর কাঁপিয়ে, খিলখিল করে হেসে উঠল। ঝুঁকে পড়ায়, মাথাটা প্রায় উদিতের গাল ছুঁয়ে গেল। একটা মিষ্টি গন্ধ চুল থেকে পাওয়া গেল।

নারায়ণ বলল, 'আমি কি ভুল বলেছি মিস মজুমদার?'

সুতপা হাসতে হাসতেই বলল, 'না, সত্যি বলেছেন। অনুরাগ না থাকলে, রাগ চণ্ডাল হয়ে ওঠে।'

সুতপাও নারায়ণের তালে তাল দিচ্ছে। নারায়ণ বলে উঠল, 'ঠিক বলেছেন।'

উদিত মুখ না ফিরিয়ে, গম্ভীরভাবে বলল, 'তবে কেউ রাগ করে নি, এই যা রক্ষে।'

সুতপা ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে, উদিতের দিকে তাকালো। উদিত নির্বিকার ভাবে গাড়ি চালাতে লাগল। আবার বলল, 'আর আমি যখন রাগ করি, তখন কোনো অনুরাগ থাকে না। আমার রাগ একেবারে চণ্ডাল।'

বলে সুতপার দিকে মুখ ফেরালো। সুতপা বলল, 'যাক্, জানা রইল।'

সেই মুহূর্তেই নারায়ণের গলায় গুণগুণ সুর শোনা গেল। উদিত

অবাক হয়ে একবার নারায়ণ, এবং সুতপার দিকে তাকালো। সুতপা ঠোঁটের ওপর হাত চাপা দিল। তার সারা মুখে ও চোখে হাসির ছটা। উদিত জিজ্ঞেস করল, 'কী হল নারাণ।'

নারায়ণ বলল, 'কী আবার হবে।'

'গান করছিস?'

'করতে ইচ্ছে করছে।'

সুতপা বলে উঠলো, 'একটা গান করুন না নারায়ণবাবু।'

নারায়ণ যেন হঠাৎ থতিয়ে গেল, 'অ্যাঁ?'

সুতপা বলল, 'একটা গান করুন।'

নারায়ণ লজ্জা পেয়ে গেল। বলল, 'না না, আমি সত্যি গান জানি না। এক এক সময় গান করতে ইচ্ছে করে, করতে পারি না।'

উদিত বলল, 'বাঁচালি।'

সুতপা উদিতের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

উদিত বলল, 'আমার আবার সকলের গান সহ্য হয়-না।'

সুতপা নারায়ণের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য তার দিকে দেখল। নারায়ণ তার গালফোলা মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'ওর কথা বাদ দিন। এতদিন ধরে দেখছি তো, খালি গাড়ি চালাতে জানে।'

সুতপা উদিতের দিকে দেখল। উদিতও একবার দেখল। নারায়ণ বলে উঠল, 'তার চেয়ে, আপনি একটা গান করুন মিস মজুমদার।'

সুতপা চমকে উঠে বলল, 'আমি?'

'হ্যাঁ।'

'মাপ করবেন, 'আমার গলা দিয়ে কোনদিন স্বর বেরোয় নি।'

উদিত বলল, 'আপনার গলা শুনে তা মনে হয় না। মানে আপনার গলার স্বর।'

সুতপা বলল, 'গলার স্বর যেমনই হোক, তাতে গান গাওয়া যায় না।'

উদিত তাকালো সুতপার দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি জানেন না ?'

সুতপা ঘাড় নেড়ে বলল, 'পারি না।'

নারায়ণ বলল, 'বেশ জমতো।'

সুতপা বলল, 'তার চেয়ে আপনি যা পারেন, তাই করুন নারায়ণবাবু। বেশ তো গুণগুণ করছিলেন।'

নারায়ণ তার মোটা ঠোঁট টিপে একটু হাসল। তারপরে গলা খাকারি দিল।

উদিত ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকালো। নারায়ণ হাত তুলে বলল, 'না না, ভয় নেই আমি গাইব না।'

সুতপা আর একবার খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, 'বারে, গাইবেন না কেন।'

নারায়ণ বাঁ দিকে হেলে পড়ে বলল, 'সত্যি জানি না।'

উদিত বুঝতে পারল, সুতপা এখনো নিঃশব্দে হাসছে।

গাজোলে পৌঁছুবার আগেই সুতপার চোখ বুজে এল। উদিতের কাঁধের কাছে তার মাথা নেমে এল। একটা হাত উদিতের কোলের কাছে। স্পীডোমিটারের আলোয় সুতপাকে এখন কেমন করুণ আর অসহায় দেখাচ্ছে। উদিত একবার পাশ ফিরে দেখল। এরকম কোন মেয়ে কখনো এমন করে ওর পাশে বসেনি। সুতপা সত্যি সুন্দরী। নারায়ণের সঙ্গে ওর চোখাচোখি হয়ে গেল। নারায়ণ হাসল, চোখের ইশারা করল একটু। ফিসফিস করে বলল, 'তোকে দেখছি সত্যি ভাল লেগে গেছে।'

উদিত শব্দ করে বলল, 'ওঁর ব্যাগটা সামলে রাখ, হেলে

পড়েছে।'

নারায়ণ তাড়াতাড়ি ব্যাগটা সামলে রাখল। গাড়ি গাজোল থেকে, শামসীর দিকে বাঁক নিয়ে, দু তিন মাইল এগোতেই, পিছনে একটা জোরালো আলো দেখা গেল। উদিত চমকে উঠল। জানালার কাছে, ভিউ ফাইণ্ডারের কাঁচের দিকে তাকাল। জোরালো আলোর জন্য স্পষ্ট দেখা না গেলেও, সেই জীপ গাড়িটাই মনে হচ্ছে।

নারায়ণ পিছনের জানালা দিয়ে উঁকি দিল। আলোটা খুব দ্রুত ওদের পিছনে পিছনে এগিয়ে আসছে। উদিত বাইরের অন্ধকারে তাকিয়ে দেখল, রাস্তায় জলের ইশারা জেগে উঠেছে। কিছু ঘন গাছপালাও দেখা যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করল, 'সামনে কি জঙ্গল আছে?'

'আছে, বিল আর জঙ্গল। কিন্তু উদিত পেছনে ওটা কী আসছে?'

'মনে হচ্ছে, সেই জীপটা।'

'খবরদার পাশ দিবি না।'

'মাথা খারাপ, আমার সামনে ওকে যেতে দেব না। কিন্তু কথা হচ্ছে, সামনে রাস্তায় জল উঠে গেছে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ইংলিসবাজারেই শুনেছিলাম, শামসীর কাছাকাছি জল পাওয়া যেতে পারে। আমসলের বিলটা নাকি ভেসে গেছে। মহানন্দার ওপর পুলটা ঠিক থাকলেই হয়।'

পিছনে জোরে জোরে হর্ণ বেজে উঠল। পাশ দেবার জন্য, পিছনের গাড়ি থেকে লাইটের সিগন্যাল আসতে লাগল। সুতপা ধড়মড়িয়ে উঠল, ওর তন্দ্রা ভেঙে গেল হর্ণের শব্দে। ঘুম ভাঙা চমকে এবং খানিকটা ভয় বিহ্বলতায় এবার ওর ডান হাতটা উদিতের কোলের ওপরে উঠল। বলল, 'কী হয়েছে?'

উদিতের চোখ ভিউ ফাউণ্ডারে। ওর মুখটা শক্ত। নারায়ণও

জানালা দিয়ে তাকাল। এখন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বিজয় দাশদের জীপটা।

উদিত বলল, 'আমাদের পিছনে একটা জীপ আসছে।'

সুতপা যেন চমকে উঠে বলল, 'সেই জীপটা নাকি, ইংরেজবাজারে যেটা দেখেছিলাম?'

'মনে হচ্ছে।'

'আমাদের পিছু নিয়েছে নাকি? সর্বনাশ!'

'নিতে পারে, আপনার ভয় পাবার কিছু নেই।'

সুতপা উদিতের মুখের দিকে তাকাল। উদিতও একবার দেখল তাকে। সুতপা যেন হঠাৎ খেয়াল করল ওর হাত উদিতের কোলে। তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নিয়ে এল।

নারায়ণ বলল, 'বিজয় দাশ কি সত্যি আমাদের পিছু নিতে চাইছে?'

উদিত বলল, 'লোকগুলোকে আমার ভাল লাগেনি।'

'কী চায় ওরা, টাকা? স্মাগলিং করে বলেই তো জানি।'

'স্মাগলারের ডাকাত হয়ে উঠতে কতক্ষণ। অবিশ্যি, অন্য একটা উদ্দেশ্যও থাকতে পারে।'

'কী রকম?'

উদিত সুতপার দিকে তাকাল। সুতপা ওর দিকেই তাকিয়ে ছিল। সুতপার টানা চোখ দুটিতে ভীত জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল। নারায়ণও সুতপার দিকে তাকাল।

সুতপা জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা কি আমার বিষয়ে কিছু ভেবেছে?'

উদিত বলল, 'ভাবতে পারে। ইংলিশবাজারে ওরা আপনাকে বিশেষভাবে দেখছিল।'

সুতপা বলল, 'সেটা আমিও দেখেছি। আমার মনে হয়, একটা লোকের মুখ আমার চেনা।'

'কে ?'

'একজন অবাঙালী, মেটেলিতে লোকটাকে দেখেছি মনে হয়। বোধহয় চালসা ফরেস্টের কন্‌ট্রাক্টর।'

উদিত সুতপার দিকে আবার দেখল। বলল, 'মেটেলিতে অনেকেই আপনার চেনা বুঝি ?'

সুতপা হঠাৎ আবার সাবধান হয়ে গেল। বলল, 'না, মানে দু একবার গেছি, তাতেই যা চেনাশোনা।'

নারায়ণ বলে উঠল, 'আপনার মুখটা আমার খুব চেনা চেনা লাগছিল। হয় তো মেটেলিতেই কখনো দেখে থাকব।'

সুতপা ছোট করে জবাব দিল, 'তা হতে পারে।'

রাস্তায় ক্রমে জল দেখা দিল। দু পাশে, জলে জেগে ওঠা ঘন জঙ্গলের মাথা থেকে রাস্তা অনুমান করে উদিতকে চলতে হচ্ছে। গাড়ীর স্পীডও কমাতে হয়েছে। রাস্তার জলে কচুরিপানাও ভেসে এসেছে। পিছনের জীপটা এখন আর হর্ণ বাজাচ্ছে না। ওরাও জলের জায়গাটা সাবধানে পার হতে চাইছে। ট্রাকের থেকে, জীপ আরো নিচু, তাই ওদের ভয় বেশি।

নারায়ণ বলল, 'শামসী পর্যন্ত যেতে পারলে, রেল স্টেশন পাওয়া যাবে। ওখানে একবার ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করে নিতে হবে, কী চায় ওরা।'

উদিত বলল, 'মাথা খারাপ নাকি, ওদের সঙ্গে আমাদের মোকাবিলার কী থাকতে পারে। আমরা জানতে দিতেই বা যাব কেন, আমাদের পিছু নিয়েছে।'

'কিন্তু যদি রাস্তার মাঝখানে কোনরকম গোলমাল লাগায় ?'

'দেখা যাবে।'

উদিতের মুখ শক্ত আর কঠিন দেখাল। আবার বলল, 'তাছাড়া তোর কাছে লোডেড রিভলবার রয়েছে তো।'

'নিশ্চয়।'

সুতপা দুজনকেই দেখছিল, কথা শুনছিল। চোখে ওর ভয়ের ছাপ। জিজ্ঞেস করল, 'লাইসেন্সড রিভলবার?'

নারায়ণ বলল, 'হ্যাঁ।'

'সব সময় নিয়ে ঘোরেন?'

'মাঝে মধ্যে দরকার হয়, টাকা পয়সা থাকে তো।'

সুতপা উদিতের দিকে তাকাল। উদিত সেটা লক্ষ্য করে বলল, 'ভয় পাবেন না, ওটা ম্যালেরিয়া জ্বরের মত, একবার চাপলে ভূতের মত চেপে ধরে।'

সুতপা বলল, 'আমি ভয় পেতে চাই না।'

উদিত একটু হাসল, বলল, 'কিন্তু ভরসাও তেমন পাচ্ছেন না।'

সুতপা যেন আরো উদিতের কাছে ঘন হল। ওর নিশ্বাস লাগল উদিতের ঘাড়ের কাছে।

আমসলের বিলাঞ্চলটা পেরিয়ে, রাস্তা আবার শুকনো। উদিত স্পীড বাড়াল। পিছনের জীপও স্পীড বাড়িয়ে আবার হর্ণ দিতে লাগল। এবার যেন পিছনের গাড়ি থেকে, চিৎকার হাঁকডাকও শোনা গেল।

নারায়ণ বলল, 'খিস্তি করছে।'

উদিত বলল, 'করুক।'

'পিছনে গিয়ে কথা বলে আসব?'

'দরকার নেই।'

'গুলি করে ওদের চাকা পাংচার করে দিলেই তো মিটে যায়।'

'সেটা বেআইনি।'

'কিন্তু ওরা আগে যেতে চাইছে কেন?'

'ওদের তাড়া আছে তাই।'

নারায়ণ চুপ করল। উদিতের দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল। বলল, 'কী যে বলিস, তোকে আমি বুঝি না।'

উদিত বলল, 'না বোঝবার কী আছে। আমরা কোনরকমেই

ওদের সঙ্গে টক্কর দিতে চাই না, কিন্তু ওদের আমার আগে যেতে দেব না।'

'শামসীতে গিয়ে ওরা চান্স নেবে।'

'নিতে দেব না! শামসীতে আমি দাঁড়াব না।'

শামসীতে কিছু আলো আর লোকজনের দেখা পাওয়া গেল। রেললাইন এখনো ডোবেনি। স্টেশনে এসে আশেপাশে লোকেরা আশ্রয় নিয়েছে। উদিত শামসীতে গাড়ি এত আস্তে করল, যেন দাঁড়াবে। কিন্তু রাস্তার মাঝখান থেকে, একটুও নড়ল না। একবার প্রায় দাঁড়িয়েই পড়ল। পিছনে জীপটার ব্রেক কষা এবং কয়েকজনের নেমে পড়ার জুতোর শব্দ শোনা গেল। উদিত হঠাৎ জোরে গাড়ি ছেড়ে দিল।

শামসী থেকে মালতীপুর। মালতীপুরের রাস্তায়, চান্দুয়া আর বলরামপুরের বিলের জল রাস্তা ছুঁয়েছে। কিন্তু ডোবায়নি। উদিতের দৃষ্টি সামনে। স্পীডোমিটারের কাঁটা আশি মাইলে ছুঁয়েছে। এত ভারি ট্রাকটাও থরথর করে কাঁপছে। উদিত বুঝতে পারছে, সুতপার অজান্তেই বোধহয়, ওর একটা হাত উদিতের কাঁধে এসে উঠেছে। স্পীডের জন্য ভয় পাচ্ছে। নারায়ণ কোন কথাই বলছে না। মনে হয়, সেও ভয় পেয়েছে।

শামসী থেকে চাঁচল পর্যন্ত, ন মাইল এল যেন চোখের পলকে। চাঁচলে এসে স্পীড কমাতে হল। খরবা থানার চেক গেট এখানে। একটা সরকারি বাংলো আছে। নারায়ণ বলল, 'চাঁচলের বাংলোয় রাতটা থেকে গেলে কেমন হয়?'

সুতপা বলে উঠল, 'জীপটাকে যদি এড়ান যায়, তাহলে বাংলোয় যাওয়া ভাল।'

উদিত বলল, 'না, যতটা পারি আমরা বেরিয়ে যাবারই চেষ্টা

করব। কোথাও দাঁড়াতে চাই না।'

'উদিত, তুই হয়তো টায়ার্ড হয়ে পড়বি।'

'আগেও আমি সারারাত্রি গাড়ি চালিয়েছি। কিন্তু এঞ্জিনে এবার একটু জল দিতে হবে।'

চেক গেটের কাছেই, নারায়ণ রাস্তার পাশের জলা থেকে জল এনে এঞ্জিনে ঢালল। চেক হল নামমাত্র। একবার গাড়িটার চারপাশ দেখল। ভিতরে আলো ফেলে সুতপাকে একবার দেখে নিল। নারায়ণ পুলিশকে কিছু বলতে যাচ্ছিল। নিশ্চয় জীপটার বিষয়। উদিত ঠোঁটে আঙুলের ইশারায় বারণ করল।

চাঁচল থেকে গাড়ি পশ্চিমে বাঁক নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় ঢুকল। ভিঙল, কোনার পেরিয়ে তুলসীহাট থেকে উত্তরে, কস্তুরিয়া দিয়ে, ওয়ারির দিকে এগিয়ে চলল। নারায়ণই রাস্তার কথা বলছিল।

সুতপা আগের থেকে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল। ওর চোখের পাতা আবার ভারি হয়ে আসছিল, উদিতের দিকে হেলে পড়ছিল। এ সময়ে, উদিতেরও যেন একটা ঢুলুনি ভাব লাগল। ওপাশে নারায়ণ চোখ বুজে, পিছনে হেলান দিয়ে আছে। বোধহয়, তারও ঘুম আসছে। ঘুম জিনিসটা বড় ছোঁয়াচে। পাশাপাশি দুজন ঘুমোলে, আর একজনের পক্ষে চোখ চেয়ে গাড়ি চালানো কঠিন ব্যাপার। যে চালায় সে ছাড়া এটা অন্য কেউ বোঝে না।

মানিকচক থেকে, ইংরেজবাজার পর্যন্ত ছেড়ে দিলেও, ইংরেজ-বাজার থেকে এ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ মাইল রাস্তা গাড়ি একটানা চলেছে। উদিত হাত উল্টে ঘড়ি দেখল। প্রায় একটা বাজে। ওয়ারি থেকে বিহার রাজ্য পড়বে। পূর্ণিয়া জেলার ভিতর দিয়ে যেতে হবে। সেখানকার রাস্তার অবস্থা কোথায় কী, জানা নেই। তবে এই পথেই নারায়ণ আর মিহির এ গাড়ি নিয়ে এসেছিল। তার থেকেও দুশ্চিন্তার বিষয়, ছিনতাই আর ডাকাতদের জন্য। একটাই

রক্ষে, ছোট গাড়ি নয়, ট্রাক। লুট করবার উদ্দেশ্য থাকলে, ট্রাকও আক্রমণ করতে পারে। ভেবে অবিশ্যি লাভ নেই, করলে দেখা যাবে।

সুতপার গা আর চুল থেকে সুন্দর একটা গন্ধ লাগছে। সুতপার মাথা ওর কাঁধে ঠেকে রয়েছে। ওর নাম কি সত্যি সুতপা। ও কে, মেটেলিতে কেন যাচ্ছে। পরিচয় চাপছে, বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কেন। উদিত নারায়ণ যদি ওর পরিচয় পায়, তাহলে ক্ষতির কী থাকতে পারে। নারায়ণের কি সত্যি চেনা মুখ বলে মনে হয়েছে সুতপাকে, নাকি একটা বাজে কথা বলছে। অবিশ্যি, নারায়ণের অনেক জায়গায় যাতায়াত, অনেক রকম পরিবেশে। জীপের লোকগুলো সুতপাকে এমনভাবে দেখছিল, যেন চেনে, অথবা অন্য কোন মতলব নিয়ে, পিছন নিতে চাইছিল। সুতপা সুন্দরী, বেশ বড়লোকের মেয়ে, বোঝা যায়।

উদিত ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল। হঠাৎ যেন বিমনা হয়ে পড়ল। সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়ি ঠিক রাখল। কিন্তু মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। বিপদ ভয়, সবকিছুর মধ্যে উদিতের ওপর সুতপার এত ভরসা কিসের। এত নির্ভরতা কেন, কেবল কি তা-ই। আজ সকালের দিকে হাওড়ার বুকস্টলে যে মেয়েকে দেখেছিল, মানিকচক থেকে যে মেয়েকে সে হাতে ধরে ট্রাকে তুলেছিল, এ কি সে-ই মেয়ে, যে অনায়াসে ওর কাঁধে মাথা পেতে দিয়ে ঘুমোচ্ছে। এ কি কেবল বিশ্বাস, না আর কিছু। মীনা আর নারায়ণের কথা মনে পড়ে গেল, উদিতকে নাকি সুতপার খুব ভাল লেগেছে।

কী থেকে সেটা বোঝা যায়, উদিত জানে না। শুধু এইটুকু মনে হচ্ছে, কলকাতায় বৌদির বোনও বোধহয়, এমন অনায়াসে ওর কাছে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারেনি। অথচ আজ সকালে সুতপাকে ও চোখে দেখেছে, সন্ধ্যায় কথা, তাও অপরিচিতই বলতে হবে।

এটা কী করে সম্ভব হচ্ছে পুরুষ হিসাবে উদিতকে কি সুতপার ভয় নেই।

কাঁধের কাছে একটু চাপ লাগতে উদিত আবার একবার তাকাল। সুতপা ওর দিকে চেয়ে আছে। নিচু স্বরে বলল, 'খুব কষ্ট হচ্ছে, না?'

'কেন?'

'একলা জেগে জেগে গাড়ি চালাচ্ছেন।'

'কষ্ট হচ্ছে না, চোখ বুজে আসার ভয় লাগছে।'

একটু চুপচাপ। সুতপার গলা আবার শোনা গেল, 'আপনি আমাকে মেটেলি অবধি পৌঁছে দেবেন?'

উদিত অবাক হয়ে বলল, 'শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনেই তো যেতে পারবেন।'

'রেলরাস্তা যদি ঠিক থাকে।'

'তা সত্যি।'

'যদি ঠিক না থাকে?'

'তাহলে একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কি ব্যবস্থা?'

'এখন কী করে বলব।'

'আমি আপনার সঙ্গে যেতে চাই।'

উদিত সুতপার দিকে তাকাল। সুতপার মত মেয়ের চোখের অনুরাগ ওর চেনা নেই। কিন্তু সুতপার চোখের দিকে চেয়ে ওর বুকে কেমন দোলা লেগে গেল। সুতপা মাথাটা সরাচ্ছে না। আবার বলল, 'আপনার কি অনেক কাজ আছে?'

উদিত বলল, 'আমি বেকার।'

আবার চুপচাপ, কেবল এঞ্জিনের শব্দ। এবার উদিত জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে এত বিশ্বাস করছেন কেন বলুন তো।'

সুতপা বলল, 'কথাটা আমিও সন্ধ্যেবেলা থেকে ভাবছি। কেন

তা আমিও জানিনা।'

উদিত আবার তাকাল। সুতপার স্থির চোখ, ওর ওপর নিবদ্ধ। ঠোঁটে কেমন একটা হাসি, দাঁত দেখা যাচ্ছে না। উদিত সামনে তাকাল। সুতপার নিচু স্বর শোনা গেল আবার, 'মানুষের মন বোঝা যায় না, আমি আমার মনই বুঝি না। বুঝতে পারছি না।'

উদিতের একবার মনে হল, বড়লোকের মেয়ে, প্রেম প্রেম খেলার অভ্যাস আছে হয়তো। কিন্তু কথাটা ওর নিজের কাছেই বেমানান লাগল। প্রেম প্রেম খেলা কি এইরকম। সেরকম চটুলতা তো সুতপা একবারও দেখায়নি। ঢঙ বা ঢলাঢলি যাকে বলে, সুতপার আচার আচরণে তার কিছুই নেই। যেন অনেকদিনের চেনাশোনার মত, উদিতের কাছে অনায়াসে নিজেকে সঁপে দিয়েছে।

সুতপার গলা আবার শোনা গেল, 'মানুষ চিনতে পারি কী না, জানি না। কিন্তু আমার এরকম কখনো হয়নি।'

উদিত জিজ্ঞেস করল, 'কী রকম?'

'সামান্য চেনা একটা মানুষের সঙ্গে—পুরুষের সঙ্গে, এভাবে মিশে যাওয়া।'

উদিত কিছু বলল না। ওর কাঁধে, সুতপার নরম চুলের চাপ লাগল আবার। শোনা গেল, 'আপনার কী মনে হয়।'

উদিত জিজ্ঞেস করল, 'কিসের?'

'আমাকে? আমাকে আপনার কী মনে হচ্ছে। রাস্তার একটা বাজে খারাপ মেয়ে, না?'

'তা কেন মনে হবে।'

'তবে?'

উদিতের বুকের কাছে কিছু যেন দাপাদাপি করছে। কথা বলতে পারছে না। এখন তাকাতেও পারছে না। ওর ভিতরের আবেগটা যেন কেমন রক্তিম আর মাতাল হয়ে উঠতে চাইছে। একটু পরে বলল, 'আমি যেন ঠিক ভাবতে পারছি না।'

'আমিও না।'

বলতে বলতে সুতপা এক হাত দিয়ে উদিতের বলিষ্ঠ গলা স্পর্শ করল, উদিত সুতপার মুখের দিকে তাকাল, ওর বুকটা ধকধক করতে লাগল, কনুইয়ের কাছে ওর হাতের ওপর রাখা সুতপার নখ রাঙানো ফর্সা হাতটা একবার দেখল। বলল, 'আমি একটা সামান্য ছেলে।'

'আমি কি অসামান্য?'

'মনে হয়।'

'কী রকম?'

'সব ব্যাপারেই। রূপ গুণ অবস্থা। সকালবেলা স্টলের কথা মনে আছে?'

'মানিকচক থেকে প্রথম মনে পড়েছিল, কোথায় যেন এ মুখ সকালে দেখেছি।'

'তখন আমার মনে হয়েছিল, বড়লোকের অহংকারি মেয়ে।'

'বড়লোক হয় তো, হ্যাঁ আমি বড়লোকের মেয়ে, কিন্তু অহংকারি না।'

উদিত আবার তাকাল। সুতপার মুখটা একটু এগিয়ে এল, বলল, 'আমি অসামান্য নই।'

উদিতের বুকের মধ্যে ধকধকানি বাড়ল। গাড়ির স্পীড ক্রমে কমতে লাগল। সুতপার শরীরের স্পর্শ লাগছে ওর বাঁদিকের গায়ে। সুতপা আবার বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, আমার পিছনে কিছু নেই, সামনে কিছু নেই, আছে শুধু এই বর্তমানটা। এই বর্তমানের মধ্যেই আমার হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।'

উদিত বলল, 'তা কি যাওয়া যায়?'

'বিচার করতে ইচ্ছা করছে না। বরং আমার গান করতে ইচ্ছা করছে।'

'গান?'

'হ্যাঁ, এই ভদ্রলোক না থাকলে, আমি গান করতাম, যাব না

যাব না যাব না ঘরে।'

সুতপার কথা শেষ হলো না। পিছনে একটা আলোর ঝলক দেখা গেল। উদিত চকিত হয়ে, ভিউ ফাইণ্ডারের দিকে তাকাল। সেই জীপ, দুরন্ত গতিতে এগিয়ে আসছে। ওর ভুরু কুঁচকে উঠল, মুখ শক্ত হল। সুতপা এত কাছে, ওর কোলের ওপর দিয়ে, স্টিয়ারে হাত দিল। স্পীড অনেক বাড়িয়ে দিল।

সুতপার চোখে উদ্বেগ ফুটল আবার, জিজ্ঞেস করল, 'সেই তারা?'

'মনে হচ্ছে।'

'আমার মনে হয় ওদের একটা উদ্দেশ্য আছে।'

'কী উদ্দেশ্য?'

'আমাকে ধরতে চায়?'

'ধরতে চাইবে কেন?'

'হয়তো ধরিয়ে দিতে চায়।'

'তার মানে?'

'তার মানে, আমি পালিয়েছি।'

উদিত দ্রুত একবার সুতপার মুখে চোখ বুলিয়ে নিল। জীপটা অনেকখানি এসে পড়েছে। বোধহয় ওরাও আশি মাইল স্পীড তুলেছে। নারায়ণের ঘুম ভেঙে গেল। জানালা দিয়ে তাকাল। জীপটা প্রায় পিছনেই। নারায়ণ কোমর থেকে রিভলবার বের করল। জীপটা বারে বারে হর্ণ দিচ্ছে। নারায়ণ বলল, 'না আর পারা যাচ্ছে না, আমি ওদের চাকায় গুলি করব।'

উদিত ধমকে উঠল, 'একেবারেই না, বসে থাক।'

'কিন্তু এভাবে কতক্ষণ চলতে পারে?'

'ওদের আমি এগোতে দেব না।'

'কী চায় ওরা?'

উদিত সুতপাকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'কিছু

হয় তো চায়।'

নারায়ণ রাস্তার দিকে তাকাল। বলল, 'ওয়ারি পার হয়ে এসেছি না?'

'হ্যাঁ।'

'মহানন্দার জল রাস্তায় উঠে পড়েছে কী না কে জানে। সকালবেলা তো ওঠেনি দেখেছি।'

'দেখা যাক।'

এই সময়ে সামনের দিক থেকে একটা গাড়ি আসতে দেখা গেল। সামনের গাড়িটাও জীপ বলে মনে হচ্ছে। উদিত লাইটের সিগনালিং করল, অফ করল, জ্বালল। সামনের গাড়িটা রেসপনস্ করল, আলো জ্বালিয়েই এগিয়ে আসতে লাগল। উদিত দু তিনবার সিগনাল করল, তারপরে আলো জ্বেলেই, সমান গতিতে এগিয়ে চলল। যা হয় হবে, স্পীড কমানো চলবে না। ওর হাব ভাব দেখে, সামনের জীপ আলোটা একবার অফ করল। উদিতের মনে হল, পুলিসের গাড়ি। উদিত বেরিয়ে যেতে চাইল, সামান্য একটু সাইড রেখে, একই গতিতে চলল, আলো নেভাল না। এখন সামনে পিছনে হর্ণ বাজছে।

সুতপা একবার বলে উঠল, 'পুলিসের গাড়ি না?'

উদিত বলল, 'মনে হচ্ছে।'

'এ গাড়িটা দাঁড় করাতে চাইছে, মনে হচ্ছে।'

'চলে যাব।'

'মাঝখান থেকে সরছে না তো।'

'সরবে।'

উদিত শক্ত গলায় বলল। ও যতই এগিয়ে গেল, সামনের গাড়িটা ততই হর্ণ দিচ্ছে, সিগনাল করছে। উদিত কোনরকম রেসপনস্ না করে গোঁ গোঁ করে এগিয়ে গেল। সামনের জীপটা যেন ছিটকে খানিকটা সরে গেল আর একটা চিৎকার শোনা গেল,

'সোয়াইন।'

নারায়ণ সঙ্গে সঙ্গে পিছনে তাকিয়ে বলল, 'পিছনের জীপটা দাঁড়িয়ে পড়েছে, অন্য জীপটা তার পাশে।'

উদিত চালাতেই লাগল। সুতপা পিঠের কাছে ওর জামা চেপে ধরে আছে। নারায়ণ আবার বলল, 'দুটো জীপই এদিকে আসছে মনে হচ্ছে।'

উদিত বলল, 'পিছনে যে-ই আসুক, জোর করে না থামাতে পারলে, আমি থামছি না।'

অত্যন্ত দৃঢ় শোনাল ওর গলা। ও সুতপার দিকে তাকাল। সুতপাও ওর দিকেই তাকিয়েছিল। বলল, 'আপনাকে কেউ থামাতে পারবে না।'

প্রায় ভোরবেলা, তখনো আকাশে আলো পরিষ্কার হয়ে জেগে ওঠেনি, শহরের আলো নিভে যায়নি, ওরা এসে শিলিগুড়ি শহরে পৌঁছুলো।

নারায়ণ বলল, 'এখন আর অফিসের দিকে না গিয়ে বাড়ির দিকেই যাওয়া যাক।'

উদিত নারায়ণদের বাড়ি চেনে। সুতপা বলল, 'হ্যাঁ, বাড়িতে ওঠাই ভাল, আমার একটু কোথাও থামা দরকার।'

নারায়ণদের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল। দরোয়ান জেগে ছিল। সে দরজা খুলে দিল। সুতপা জানতে চাইল বাথরুম কোথায়। নারায়ণ বৌদিকে ডেকে তুলে, তার হাতে সুতপাকে দিয়ে এল। নিচে এসে সে উদিতকে বলল, 'মেয়েটা তোর প্রেমে পড়ে গেছে একেবারে।'

তার কথা শেষ হবার আগেই, বাড়ির সামনে একটা জীপ এসে দাঁড়াল। শিলিগুড়ি পুলিশের জীপ। উদিত দেখল একজন

অফিসার নেমে, নারায়ণের ট্রাকটা দেখল। ঘরের দিকে এগিয়ে এল। চেনা অফিসার। জিজ্ঞেস করল, 'এ ট্রাকটা কখন এল?'

নারায়ণ বলল, 'এই তো আসছে।'

'ড্রাইভার কোথায়?'

তাড়াতাড়ি উদিত বলল, 'মিহির ট্রাক রেখেই বাড়ির দিকে গেল, সেই চালিয়েছে।'

'কোথা থেকে ট্রাকটা এল এখন?'

'মানিকচক, মালদহ।'

'এ গাড়িতে কোন মেয়ে ছিল?'

উদিত বলল, 'না তো, কী ব্যাপার?'

অফিসার উদিতকে চেনে না, বলল, 'থাকার কথা। খবর আমরা আগেই পেয়েছি। কিন্তু ট্রাকটা শিলিগুড়ি ঢোকবার আগে ধরতে পারিনি। আর কে কে ছিল ট্রাকে।'

নারায়ণ একবার উদিতকে দেখে বলল, 'এ আর আমি।'

'কিন্তু নারায়ণবাবু এ ট্রাকে নিশ্চয়ই একজন মেয়ে ছিল। যদি জানেন তাহলে বলুন, তা না হলে, ব্যাপার অনেক দূর গড়াবে। যে মেয়ের কথা আমি বলছি, তার নাম নয়ন সিন্‌হা। আজ তিন দিন ধরে, তার জন্য কলকাতা থেকে তরাই পর্যন্ত, ওদিকে বাগডোগরা এয়ারপোর্ট, সবখানে জাল ফেলে রাখা হয়েছে, যাতে তাকে ধরা যায়। আমাদের কাছে খবর হচ্ছে, এই নম্বরের, এই মিলিটারি মাঝারি ট্রাকে তাকে দেখা গেছে।'

উদিত বলল, 'আমাদের কী লাভ বলুন মিথ্যে কথা বলে। আমরা নিশ্চয়ই তাকে ইলোপ করতে চাইনি বা, এরকম কোন মেয়েকে আমরা চিনিই না।

অফিসার বলল, 'ইলোপ করবেন কেন। তাকে হাতে রাখতে পারলে, অনেক টাকাও রোজগার করতে চাইবে। কোটিপতির মেয়ে। যে তাকে ধরে রাখবে, সেই কিছু টাকা চেয়ে বসবে। কিন্তু

আইনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কেউ ধরিয়ে দিতে পারলে, নিশ্চয়ই টাকা পাবে, অনেক টাকাই পাবে। তার চালাকি করলে, তখন সেটা দুষ্কৃত বলে ধরা হবে।

নারায়ণ উদিত কিছুই বলল না। অফিসার বলল, 'তাহলে আপনারা কিছুই জানেন না?'

নারায়ণ বলল, 'না আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

নারায়ণদের বিরাট প্রতিপত্তি। অফিসার বিশেষ কিছু না বলে, খালি বলল, ট্রাকটা যেন আর কোথাও পাঠাবেন না, আপনারা দুজনে বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবেন না।'

অফিসার চলে গেল। নারায়ণ আর উদিত অবাক হয়ে দুজনের দিকে তাকাল। এ সময়ে সুতপা নেমে এল। উদিত আচমকা বলল, 'আপনার নাম নয়ন সিন্‌না।'

সুতপা চমকে উঠল। নারায়ণ পুলিশের কথা বলল। সুতপা ভয়ার্ত মুখে বলল, 'তাহলে আর আমি এক মুহূর্ত এখানে থাকতে চাই না। আমার পালানো দরকার।'

উদিত বলল, 'ব্যাপার কী?'

সুতপা বলল, 'পরে সব বলব, আপনি আমাকে মেটেলিতে পৌঁছে দিন।'

'কিন্তু কী করে যাব? চারদিকে আপনার জন্য জাল ফেলা হয়েছে।'

'এখনো একটু অন্ধকার আছে। অন্য একটা গাড়ি নিয়ে, আমরা মেটেলিতে যেতে পারি।'

উদিত নারায়ণের দিকে তাকাল। নারায়ণ বলল, 'একটা জিপ ব্যবস্থা হতে পারে, কিন্তু কোন পথে যাবি?'

উদিত বলল, আমার মনে হয়, সেবক ব্রিজ দিয়ে গেলে, ওদিকে ধরে ফেলবে। কারণ ভাববে ওদিক ছাড়া রাস্তা নেই। আমরা যদি জলপাইগুড়ি হয়ে বার্ণেস দিয়ে আবার উজোন যাই মেটেলিতে,

ধরতে পারবে না।

'ঠিক বলেছিস।'

উদিত বলল, 'কিন্তু আমার জানা দরকার, আমি এমন কোন অপরাধ করছি কী না। যেটা আমাকে অপমানিত করবে।'

সুতপা ওর হাত ধরে বলল, 'আপনি কোন অপরাধই করছেন না। শেষে সব জানতে পারবেন, হয় তো আপনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাবেন। পরে সবই আপনাকে আমি বলব।'

আর দেরি না করে, নারায়ণের গ্যারেজ থেকে জিপ বের করল উদিত। সব দেখে শুনে সুতপাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, জলপাইগুড়ির পথে।

সকাল ন'টার মধ্যেই বার্ণেস পেরিয়ে, মালবাজারের রাস্তায় পড়ল। মেটেলির চা বাগান অঞ্চলে, ওরা যখন পৌঁছল তখন প্রায় বারোটা। সুতপার কথানুযায়ী মেটেলির পাহাড়ে টিলার ওপরে, যে বিশাল বাংলো প্রাসাদে এসে ওরা উঠল, উদিত সেটাকে প্রচুর চা বাগানের মালিক টিকিং দীপেন্দ্র সিংহের বাংলো বলেই জানে। দীপেন্দ্র সিংহ মারা গিয়েছেন কয়েক মাস। তাঁর স্ত্রী এখন এখানে আছেন।

সুতপা দৌড়ে বাংলোয় ঢুকল। চাকর দারোয়ান আয়া লোকজন সব হৈ হৈ করে উঠল। আর পিছনে পিছনে এল আরো কয়েকটা গাড়ি। সবই পুলিশের এবং অন্যান্য আরো কিছু।

প্রথমেই একজন অফিসার এসে, উদিতের হাত চেপে ধরল। আর সেই মুহূর্তেই বাংলোর বারান্দায়, সুতপাকে দেখা গেল এক মহিলার সঙ্গে। তিনি সুতপাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। তিনি পুলিশ অফিসারকে বললেন, 'ওকে ছেড়ে দিন, আমার কাছে আসতে দিন। এই আমার মেয়ে আমার কাছে।'

পুলিশ অফিসার অবাক হয়ে উদিতকে ছেড়ে দিল। উদিত বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল।

সমস্ত ঘটনার আকস্মিকতায়, উদিত বিস্মিত এবং চমকিত! যদিও, সমস্ত ঘটনা ওর এখনো জানা হয়নি। ইতিমধ্যেই যা ঘটেছে, তাতেই ও অবাক। সুতপা এখন আর সুতপা নয়, নয়ন সিন্‌হা বলাই উচিত। উদিতের পক্ষে যেন বিশ্বাস করাই কঠিন, তরাইয়ের বিখ্যাত চা ম্যানুফাকচারার, যাকে টি-কিঙ্‌ বলা হতো, সেই ডি সিন্‌হা—অর্থাৎ দীপেন্দ্র সিংহের বিলাসবহুল বাংলোয় ও বসে আছে। আর নয়ন সেই দীপেন্দ্র সিংহেরই একমাত্র মেয়ে। যাকে বলা যায় কোটিপতির মেয়ে। এখন নারায়ণের কথা ওর বিশেষ-ভাবে মনে পড়ছে। নারায়ণ যে বার বার বলেছিল, নয়নের মুখ তার চেনা চেনা লাগছে, সেটা মিথ্যা না। নারায়ণ নিশ্চয়ই এর আগে নয়নকে দেখেছে। নানা কারণেই, নারায়ণ মোটেলিতে এসেছে। নয়নও নিশ্চয়ই অনেকবার শিলিগুড়িতে গিয়েছে এবং সবাই এক ডাকেই, ডি সিন্‌হার মেয়েকে চিনতে পেরেছে। শুধু শিলিগুড়িতে কেন, আরো অনেক জায়গাতেই হয়তো নয়নকে দেখা গিয়েছে

সমস্ত ঘটনা জানবার জন্য, উদিতের মনে তীব্র কৌতূহল জেগে উঠল। নয়নের কাছ থেকেই সমস্ত ঘটনা জানতে হবে। কিন্তু আপাততঃ তার সুযোগ নেই। বসবার ঘরে, প্রায় একটা সভা বসে গিয়েছে। জেলা পুলিশের বড় কর্তা পর্যন্ত হাজির। তা ছাড়া অন্যান্য অফিসাররাও আছেন। টি-এষ্টেটের বড় বড় কর্মচারীরাও রয়েছেন।

উদিত দেখল, নয়নের মা, মিসেস্ হেমলতা সিন্‌হা এক ব্যক্তিত্বশালিনী মহিলা। সকলের ওপরেই যে তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি, তা তাঁর ব্যবহারেই বোঝা গেল। যদিও, এই মুহূর্তে তিনি খুশি ও আবেগে ভরপুর। সবাইকে চা-খাবারে আপ্যায়ন করে, সকলের কাছেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন, ধন্যবাদ জানালেন। জেলা পুলিশের বড় কর্তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানালেন। বললেন,

'আমার মেয়েকে ফিরে পাবার ব্যাপারে, আপনারা যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

জেলার কর্ণধার গাম্ভীর্যের মধ্যেই একটু হেসে বললেন, 'আমরা মিস্ সিন্‌হাকে নিরাপদে এখানে নিয়ে আসার যথেষ্ট চেষ্টা করেছি, তবে ব্যাপারটা আমাদের হাতে ছিল না।'

বলে তিনি উদিতের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকালেন। বললেন, 'আমি এই উদিতবাবুর কোনো পরিচয় জানি না। মালদহ থেকে শিলিগুড়িতে খবর আসে যে, একটি মেয়েকে নিয়ে, দুজন যুবককে একটি ট্রাকে রওনা হতে দেখা গেছে। কিন্তু কোথায় তারা রওনা হয়েছে, সে খবর সঠিক জানা যায় নি। পরে আবিশ্যি আমরা জানতে পেরেছি, ট্রাকটি শিলিগুড়িতেই এসেছে। ট্রাকটিকে অনুসরণ করে আমরা ঠিক জায়গাতেই গেছলাম। কিন্তু পুলিশের কাছে উদিতবাবুরা মিথ্যে কথা বলেছিলেন। মিস্ সিন্‌হার কথা উদিতবাবু অস্বীকার করেছিলেন। এক্ষেত্রে তার উচিত ছিল, পুলিশের কাছে সারেণ্ডার করা।'

উদিত অপ্রস্তুত হয়ে, সকলের দিকে একবার তাকাল। নয়ন বলে উঠল, 'সেটা উদিতবাবুর দোষ নয়, আমিই বারণ করেছিলাম।'

জেলা কর্ণধার একটু নরম সুরে, সম্ভ্রমের সঙ্গে বললেন, 'সেটা আপনি ঠিক করেন নি মিস্ সিন্‌হা। প্রথমতঃ আপনার মায়ের অনুরোধে, সমস্ত ব্যাপারটাই গোপন ছিল। তিনি চান নি, কলকাতার আত্মীয়ের বাড়ি থেকে আপনি যে পালিয়েছেন, সেটা এ অঞ্চলে জানাজানি হোক। কিন্তু ধরে নেওয়া হয়েছিল আপনি যে ভাবেই হোক, এদিকেই আসবেন। সেইজন্য আজ চারদিন ধরে, আমরা সবখানে আপনার জন্য জাল পেতেছিলাম। বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে সমস্ত ঘাঁটিতে। আপনার নিরাপত্তার জন্যই।

নয়ন লজ্জিতভাবে বলল, 'আমি সত্যি দুঃখিত।'

জেলা কর্ণধার হাসলেন। তাঁকে একটু বিব্রতও দেখাল। বললেন, 'অবিশ্যি এক হিসাবে ভালই হয়েছে। আমরা ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাইলেও, একেবারে গোপন থাকে নি। কিছু বাজে এলিমেণ্ট খবরটা পেয়ে যায়। কী ভাবে পায় তা জানি না। তাদের সোর্স কলকাতাও হতে পারে। তারাও আপনার পিছু নিয়েছিল। ওদের দুটো উদ্দেশ্য থাকতে পারে। এক, আপনাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে, আপনার মায়ের কাছ থেকে মোটা টাকা পুরস্কার পাওয়া। অথবা, কলকাতায় নিয়ে যাওয়া।'

উদিতের সঙ্গে নয়নের একবার চোখাচোখি হল। নয়ন ঠোঁট টিপে হাসল। বলল, 'তাদের বোধ হয় ইংলিশবাজারেই আমরা দেখেছি।

'হ্যাঁ, সেখান থেকেই, তারা আপনাদের পিছু নিয়েছিল। তারা লোক খুব মারাত্মক, মার্ডারাস্ ওয়েপনস্ তাদের সঙ্গে ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, দরকার হলে রক্তারক্তি করেও আপনাকে ছিনিয়ে নেবে।'

নয়নের চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠলো। মিসেস সিন্‌হা শঙ্কিত গলায় বলে উঠলেন, 'ভগবান বাঁচিয়েছেন।'

জেলার কর্ণধার উদিতের দিকে তাকালেন। বললেন, 'সেটা অবিশ্যি উদিতবাবুরই কৃতিত্ব। উনি নির্ভয়ে জোরে গাড়ি চালিয়েছিলেন। ওদের চিৎকারে বা ধমকে থামেন নি, বা ওদের সাইড দেন নি। কিন্তু, সামনে পুলিশের জীপ দেখেও নামেনি। আর একটু হলে পুলিশের জীপ খানায় পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত।'

উদিতের চোখের সামনে সেই দৃশ্য ভেসে উঠল। ও নয়নের দিকে একবার দেখল, মাথা নিচু করল। জেলা কর্ণধার বললেন, 'কিন্তু যারা পিছু নিয়েছিল, তারা সেই প্রথম জানল, ঘটনার পিছনে পুলিশ ঢুকে পড়েছে। তখন তারা সরে পড়ে। এনি হাউ, এখন

আমরা ধরে নিচ্ছি, যা হয়েছে, তা মঙ্গলই হয়েছে। মিস্ সিন্‌হা নিরাপদে পৌঁছেছেন।'

বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে প্রায় সকলেই। মিসেস্ সিন্‌হা বললেন, 'সেজন্য আমি আপনাদের সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ।'

একে একে সকলেই বিদায় নিলেন। উদিতের মনে হল, ওর-ও এবার বিদায় নেওয়া উচিত। ও বাইরের বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল। মিসেস্ সিন্‌হা বলে উঠলেন, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

উদিত বলল, 'আমি এখন শিলিগুড়ি ফিরে যাব।'

মিসেস্ সিন্‌হা ঘাড় নাড়িয়ে বললেন, 'অসম্ভব। তুমি আমার নয়নকে ফিরিয়ে এনেছ। তোমাকে আমি এখন ছাড়তে পারব না। তুমি ঘরে গিয়ে বস।'

নয়ন তখন সকলের সঙ্গে নমস্কার বিনিময়ে ব্যস্ত। উদিত সেদিকে একবার দেখল। মিসেস্ সিন্‌হা আবার বললেন, 'তুমি বস, আমি নয়নকে ডেকে দিচ্ছি।'

উদিত একটু লজ্জা পেল মিসেস্ সিন্‌হার কথা শুনে। মুখ ফিরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। অবিশ্যি সমস্ত ঘটনাটা আনুপূর্বিক জানবার কৌতূহল ওর রয়েছে। তাছাড়া, এভাবে যে ছাড়া পাবে না, সেটা ও বুঝতে পারছে। কিন্তু নারায়ণের গাড়ি নিয়ে এসেছে। বেশি সময় ওর পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব নয়। আজকের মধ্যেই ফিরে যেতে হবে।

উদিত এসে বসতে না বসতেই, নয়ন এসে ঘরে ঢুকল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি নাকি এখনই শিলিগুড়ি ফিরে যাবেন বলছেন?'

উদিত বলল, 'আমার কর্তব্য তো শেষ হয়েছে।'

নয়ন বলল, 'আপনার হয় তো হয়েছে, আমার তো হয় নি। ধরেছি যখন, এত সহজে ছাড়ছি না।'

কথাটা বলেই, নয়নের মুখে রঙ ধরে গেল। লজ্জা পেয়ে, চোখের পাতা একবার নামাল। কিন্তু তেমন আড়ষ্টভাব নেই।

উদিত বলল, 'কিন্তু নারায়ণদের গাড়িটা নিয়ে এসেছি।'

নয়ন বলল, 'তা হোক। নারায়ণবাবুদের একটা গাড়ি নয়, অনেক আছে। বলেন তো, আপনার বন্ধুকে ডেকে পাঠাই।'

উদিতের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'নারায়ণ এলে খুব ভাল হত। এক সঙ্গে ফিরে যেতাম।'

নয়ন বলল, 'নারায়ণবাবুরও সন্দেহ ঘুচত। উনি তো আপনাকে অনেকবারই বলেছেন, আমার মুখটা ওঁর চেনা চেনা লেগেছে।'

উদিত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সে কথা আপনি শুনতে পেয়েছেন?'

নয়ন মুখে কিছু না বলে, ঠোঁট টিপে হাসল। বোঝা গেল, শুধু এই কথাই নয়, নারায়ণের অনেক কথাই নয়ন শুনেছে। উদিত লজ্জায় ঠোঁট কামড়ে ধরল। নয়নের চোখের দিকে তাকাল। নয়নের চোখে হাসির ঝিলিক। বলল, 'আমি নারায়ণবাবুকে ট্রাংককল করছি। আমাদেরই একটা গাড়ি এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি ওঁকে নিয়ে আসবার জন্য! আমাদের জন্য না থাকুন, বন্ধুর টানে থেকে যান।'

নয়নের হাসির মধ্যে একটু অভিমানের রেশও রয়েছে। উদিত বলল, 'তা কেন। আপনাদের জন্যই থেকে যাব। তবে নারায়ণ এলে ভাল হয়।'

নয়ন বলল, 'আমারও ভাল লাগবে।'

তারপরেই সে ব্যস্ত হয়ে উঠে বলল, 'এখন চলুন তো। তাড়াতাড়ি চান করে জামাকাপড় বদলে খেয়ে নিয়ে শুতে যাবেন। কাল সন্ধে থেকে একটানা গাড়ি চালিয়েছেন।'

উদিত একটু অবাক হয়ে বলল, 'সবই করব, কিন্তু জামাকাপড় বদলাব কী করে। আমি তো কিছুই নিয়ে আসি নি।'

নয়ন বলল 'আপনার গায়ে মানিয়ে যাবার মত পায়জামা পাঞ্জাবী দিতে পারব। আসুন।'

কেমন করে তা সম্ভব উদিত জানে না। ও নয়নকে অনুসরণ করল।

উদিত বাথরুমে ঢুকল। মোজাইকের মেঝে আর চীনামাটির টালির দেওয়াল, পুরোপুরি আধুনিক স্নানের ঘর। সেখানে পাটকরা নিভাঁজ ধোয়া পায়জামা পাঞ্জাবী তোয়ালে সবই ছিল। তেল সাবান শাম্পু থেকে কিছুই বাদ নেই। এ রকম বিলাসে অভ্যস্ত থাকলেও, মনটা বেশ খুশি হয়ে উঠল।

চান করে বেরিয়েই নয়নের সঙ্গে ওর দেখা। ঝি চকরেরা আশেপাশে থাকলেও, উদিতকে দেখাশোনার সব দায়িত্ব নয়নের। নয়ন ওকে একটি ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে খাটে মোটা গদীর বিছানা এবং ড্রেসিং টেবল। নয়ন বলল, 'মাথা আঁচড়ে খেতে চলুন।'

উদিত বলল, 'একলা খেতে যাব? আপনি—আপনারা?'

'আমি পরে।'

'আপনিও তো সেই কাল সন্ধে থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

'তা হোক। মেয়েদের তাতে কষ্ট হয় না। আপনি খেয়ে শুতে আসবেন, তারপরে আমার ব্যবস্থা।'

উদিত জানে, মেয়েরা এ ব্যাপারে একটু বেশি কষ্টসহিষ্ণু। কিন্তু এ ধরনের পরিবারের মেয়েদের ক্ষেত্রে, সেটা ওর জানা নেই।

নয়ন আবার বলল, 'আপনার বন্ধুকে ট্রাংককল করা হয়ে গেছে। গাড়িও বেরিয়ে গেছে। রাত্রের খাবার সময়ের আগেই পৌঁছে যাবেন।'

উদিত বলে উঠলো, 'আপনি দেখছি সবই খুব তাড়াতাড়ি করতে পারেন।'

নয়ন ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'যথা?'

উদিত থমকে গেল। সহসা একটু অপ্রস্তুতও। তারপরে বলল, 'এই কাজকর্মের কথা বলছি।'

নয়না ঘাড় নেড়ে, চোখে ঝিলিক হেনে বলল, 'আর কিছু নয় তো ?'

বলেই পিছন ফিরল। দু'পা গিয়ে, আবার উদিতের দিকে ফিরে ডাকল, 'আসুন।'

উদিত তাকে অনুসরণ করল। মনে মনে বলল, 'হ্যাঁ, আরো কিছু। তাড়াতাড়ি মন চুরি করতেও পারে এই মেয়ে।'

খাবার ঘরে মিসেস্ সিন্‌হা আগেই বসেছিলেন। উদিতকে ডেকে বসালেন, 'এস বাবা, বস।'

খেতে বসে প্রধানতঃ, মানিকচক থেকে মেটেলি পর্যন্ত আসার বিষয়ই কথা হল। উদিতের থেকে, নয়ন বেশি বলল, মিসেস্ সিন্‌হা বারবারই উদিতকে বললেন, 'ভগবানই নয়নকে তোমায় জুটিয়ে দিয়েছিলেন। তা না হলে, আমার নয়নকে ফিরে পেতাম কী না কে জানে।'

উদিত বিব্রত লজ্জায় প্রতিবাদ করল। মিসেস্ সিন্‌হা সে কথা বোধহয় শুনতেই পেলেন না। উদিতকে বারে বারে আশীর্বাদ করলেন।

নরম গভীর শয্যায় শুয়ে উদিতের যেন ঘুম আসতে চাইল না। এতটা বিলাসের ভোগে ও অভ্যস্থ না। তা ছাড়া নতুন জায়গা, অপরিচিত পরিবেশ। কিন্তু শরীর অসম্ভব ক্লান্ত। খানিকটা নিঝুম হয়ে পড়ে রইল। আর সমস্ত ব্যাপারটাই ওর কাছে, অভাবিত আর অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। গতকাল বিকালেও ও জানতো না, নয়নের সঙ্গে ওর এভাবে পরিচয় হবে। এখানে এভাবে আসতে হবে। ভাবতেও পারে নি, নয়ন হল দীপেন সিংহের মেয়ে,

চা-জগতে যাকে বলা হয় জায়াণ্ট। উদিত এখন সেই জায়াণ্টের বিলাস-প্রাসাদের এক ঘরে শুয়ে বিশ্রাম করছে। কোনো রকমেই যেন ভাবা যায় না। ভাবা যায় না, স্তুতপা নামে যে-মেয়েটিকে ও এক সময়ে খানিকটা করুণা-ই করেছিল, সে হল নয়ন সিন্‌হা, যে আজকে বিরাট টি-এস্টেটের মালিক। অথচ নয়ন ওর সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করেছে, এখনো করছে সেগুলোও যেন বিশ্বাস করা যায় না।

খানিকটা চোখ বোজা নিঝুম অবস্থাতেই শুয়ে প্রায় ঘণ্টা তিনেক কেটে গেল। ঘুম না হলেও, বিশ্রাম হল। শরীর এখন অনেকটা ঝরঝরে। উদিত উঠে বসল। ঘরের দরজাটা খোলা। মোটা পর্দা ঢাকা দেওয়া রয়েছে। উদিত উঠে বসে দরজার দিকে তাকাতেই, পর্দা একটু ফাঁক হল।

নয়নের মুখ দেখা গেল। চোখাচোখি হতে, নয়ন ঘরে ঢুকল। জিজ্ঞেস করল, 'ঘুম হল ?'

উদিত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এক রকম। আপনি ঘুমোন নি ?'

নয়ন বলল, আমার ঘুম আসছে না। আমি এখনো রাতিমতো উত্তেজিত। বাড়িতে আসতে পেরেছি, সেটাই আমার উত্তেজনা।'

উদিত নয়নকে দেখল। সত্যি, তাকে ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে না। একটু চোখের কোণ বসা। কিন্তু তার সারা মুখে একটি চকচকে ভাব। চোখের দৃষ্টি ঝকঝকে।

উদিতের চোখ ফেরাতে একটু দেরি হল। এখন যেন নয়নকে ও অন্য চোখে দেখছে। নয়ন হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলবেন ?'

উদিত যেন একটু থতিয়ে গেল। বলল, 'না, মানে—।'

একটু ভেবে নিয়ে আবার বলল, 'সমস্ত ঘটনাটা আমার জানতে ইচ্ছে করছে।'

নয়ন ঘাড় নেড়ে বলল, 'কোন্ ঘটনা ? আমার কলকাতা থেকে পালানো ?'

উদিত বলল, 'যদি কোন অসুবিধে না থাকে।'

'তাও আবার আপনাকে ?'

নয়নের চোখে ঝিলিক হানল। বলল, 'আপনাকে না বলতে পারলে, আর কাকে বলা যাবে। চলুন, চায়ের টেবিলে যাই। মা আর আমি দুজনেই আপনাকে সব কথা বলব।'

'চলুন।'

নয়নের সঙ্গে উদিত গিয়ে দেখল, মাথা ঢাকা চওড়া বারান্দায় চায়ের টেবিল। সামনে সবুজ লন। চারপাশে ফুলের সমারোহ। টিলার ওপর থেকে, দূরে দেখা যায় চাল্‌সা ফরেস্ট। বিকেলের আলো নেই। সবই মেঘে ঢাকা। তবে বৃষ্টি হচ্ছে না। টিলার এই প্রাসাদের বারান্দায় বসে, বন্যার অবস্থা কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু ইতিমধ্যেই যে বন্যা পরিস্থিতির সে রকম কোনো পরিবর্তন হয় নি, তা অনুমান করা যায়।

চায়ের টেবিলে হেমলতা বসেছিলেন। ডাকলেন, 'এসো উদিত। ঘুম হয়েছে তো একটু।'

উদিত বলল, 'অনেকটা বিশ্রাম হয়েছে।'

চাকর ট্রেতে করে টি-পট, চায়ের সব সরঞ্জাম টেবলের ওপর বসিয়ে দিয়ে গেল। আর একজন রেখে গেল কিছু খাবার।

নয়ন হেমলতাকে বলল, 'মা, উদিতবাবুকে তুমি সমস্ত ঘটনা বল।'

হেমলতা বললেন, 'আমি কেন, তুই-ই বল্‌ না। তোকে নিয়েই তো ঘটনা।'

কিন্তু কথা শুরু করলেন হেমলতা।

মা আর মেয়ে, দুজনের কথা থেকে যা জানা গেল, তা হল একটি নিখুঁত ষড়যন্ত্রের কাহিনী। দীপেন্দ্র সিংহের এক ভাই থাকেন কলকাতায়। অর্থাৎ নয়নের কাকা, বীরেন্দ্র সিংহ। বীরেন্দ্র কলকাতার একটি বেসরকারি ফার্মের বড চাকুরে। তাঁর বাড়িব চাল চলনে পুরো বিলিতিয়ানা। দীপেন্দ্র সিংহের আর্থিক সঙ্গতির তুলনায়, বীরেন্দ্রকে গরীব বলতে হয়। কিন্তু দীপেন্দ্র তাঁর ছোট ভাইকে নানাভাবে সাহায্য করতেন।

দীপেন্দ্রর মৃত্যুর পরে, বীরেন্দ্র হেমলতাকে বলে, তাঁর সম্মতি আদায় করে, নয়নকে নিয়ে গিয়েছিলেন কলকাতায়। তাঁর সদুদ্দেশ্য ছিল, নয়নকে কলকাতার উচ্চতর সমাজে পরিচিত করানো, সেই সমাজের চাল চলনে পাকা করে তোলা। বীরেন্দ্রের বাড়িতে নাকি কলকাতার উচ্চ সমাজের যুবকদের যাওয়া আসা। তাদের সঙ্গে নয়নের পরিচয় হলে, সব দিক দিয়েই ভাল। কারণ নয়নের উপযুক্ত পাত্র কলকাতার উচ্চ সমাজেই আছে। ভবিষ্যতে যে বিখ্যাত ডি. সিন্‌হা টি-এস্টেটের দায়িত্ব নিতে পারবে।

কিন্তু বীরেন্দ্রর আসল উদ্দেশ্যটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। নয়ন সেটা কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিল। উচ্চ সমাজ সম্পর্কে নয়নের যে একেবারে কোনো ধারণা ছিল না, তা নয়। ছেলেবেলা থেকে, ও একটা বিশেষ সমাজের মধ্যেই মানুষ হয়েছে। দার্জিলিঙে থেকে পড়াশোনা করেছে। কলকাতায় ও কম যাতায়াত করেছে বটে, উচ্চ সমাজটা ওর অপরিচিত ছিল না। কিন্তু কলকাতায় কাকার বাড়িতে যে উচ্চ সমাজের স্পর্শে ও এসেছিল, তারা এক ধরনের মুখোশ আঁটা, শহুরে ফেরেববাজ ছাড়া আর কিছু না।

নয়ন আগে কখনো কাকার পরিবারের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে নি। ক্রমে, কাকাকেও ওর কলকাতার সেইসব তথাকথিত উচ্চ পর্যায়ের মুখোশ-আঁটা লোক বলে মনে হয়েছিল। পরিবারের চেহারাটাও ওর ভাল লাগে নি। ওর খুড়তুতো বোনেরা

নাচ গান মদ্যপানে অভ্যস্ত। সকলেরই অনেক পুরুষ বন্ধু। অধিক রাত্রের আগে কেউ বাড়ি ফেরে না। কাকার নিজের বন্ধুবান্ধব আড্ডাও নয়নের ভাল লাগে নি। তিনি নিজেও একজন মাতাল।

মদ সম্পর্কে নয়নের কোনো কুসংস্কার নেই। কিন্তু সীমাহীন মত্ততা, উশৃংখলতা ও সহ্য করতে পারে না। দীপেন্দ্র সিংহ নিজে ছিলেন সাত্বিক প্রকৃতির কর্মঠ মানুষ। তথাপি তিনি ক্লাবে যেতেন, বাড়িতে পার্টি দিতেন, সবাইকে পান ভোজনে আপ্যায়ন করতেন। কিন্তু সে চেহারাটা সম্পূর্ণ আলাদা।

কাকার বাড়িতে নয়নের ভাল লাগে নি। ক্রমেই যেন ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। যে সব যুবকের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছিল, তারা এক ধরনের লোভী উশৃংখল। চেহারায় বেশবাসে তারা যতই মার্জিত হোক, আর গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়াক, তাদের আসল চেহারাটা চিনতে ভুল হয় নি। নয়ন সব কথাই ওর মাকে লিখে জানাতো। কিন্তু ওর সে সব কোনো চিঠিই কোনোদিন হেমলতার কাছে পৌঁছয় নি।

নয়ন কার্যতঃ কাকার বাড়িতে বন্দী হয়ে পড়েছিল। কাকা তাঁর নিজের পছন্দমত যুবকদের সঙ্গে, নয়নের বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন। নয়ন সবগুলোই নাকচ করেছিল। বুঝতে পেরেছিল, সেই সব যুবকেরা সবাই কাকার বিশেষ অনুচর। তাদের কারোর সঙ্গে নয়নের বিয়ে হলে, সে হবে কাকার একটি প্রভুভক্ত জীব। অথচ মা যে ওর সত্যিকারের কোনো খবরই পাচ্ছেন না। সেটা ও বুঝতে পেরেছিল। আর কাকার চিঠিতে হেমলতা জানতে পারতেন, নয়ন কলকাতায় বেশ বহাল তবিয়তে আছে। মাকে চিঠি লেখার সময়ও ওর নেই।

বীরেন্দ্র শেষ পর্যন্ত যখন বুঝতে পেরেছিলেন, নয়নকে বাগে আনা যাবে না, তখনই উনি স্থির করেছিলেন, একটি ছেলের সঙ্গে জোর করেই নয়নের বিয়ে দেবেন। উদ্দেশ্য নয়নের ওপরে ভবিষ্যতে

পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রাখা। যদি বিয়ে দিতে না পারেন, তাহলে নয়নকে কোথাও লুকিয়ে ফেলবেন।

নয়ন সমস্ত বুঝতে পেরেই, কাকার বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। কাকার বাড়ি বা পরিচিতদের ছাড়াও, নয়নের আরও জানা শোনা দু'একটি পরিবার ছিল। দার্জিলিঙের কলেজেই সেই পরিচয়। গত পাঁচদিন আগেই, ও পালিয়ে গিয়ে উঠেছিল সেইরকম একটি বাড়িতে। সেখান থেকে হেমলতাকে চিঠি লিখেছিল। ট্রেনে রওনা হবার আগের দিন টেলিগ্রাম করেছিল। নয়ন কলকাতাতেই কয়েকদিন লুকিয়েছিল। বীরেন্দ্রের বাড়ি থেকে বেরিয়ে, সোজা উত্তরবঙ্গের দিকে রওনা হলে, ট্রেনেই ধরে ফেলতে পারতো। নয়ন জানতো, কাকা ওর পালাবার কথা জানা মাত্র চারদিকে তাঁর অনুচরদের ছড়িয়ে দেবেন। দিয়েছিলেনও নিশ্চয়ই। তিন চার দিনেও কোনো খোঁজ খবর না পেয়ে, হতাশ হয়ে ধরে নিয়েছিলেন, নয়ন ওর মায়ের কাছে পালিয়ে গিয়েছে। আসলে নয়ন চারদিন পরে, হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিল। তারপরের ঘটনা উদিতের মোটামুটি সবই জানা।

উদিত অবাক হয়ে সব শুনল। মনে মনে নয়নের সাহসের প্রশংসা না করে পারল না। কিন্তু স্বার্থের জন্য, অর্থের জন্য, নিজের ভাইঝির জীবনকে কেউ এভাবে বিপন্ন করে তুলতে পারে, এরকম চরিত্রের কথা ওর জানা ছিল না।

রাত্রে খাবার আগেই, নারায়ণ এসে পৌঁছুলো। সে এসেই হৈ চৈ শুরু করে দিল। নয়ন খুশি হয়ে উঠলো। নারায়ণকে হেমলতারও ভাল লেগেছে বোঝা গেল। নারায়ণের খালি এক কথা, 'আরে আমার চোখকে কখনো ফাঁকি দেওয়া যায়? আমি তো বারে বারেই বলেছি, এ মুখ আমার চেনা।